শুভতারা

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

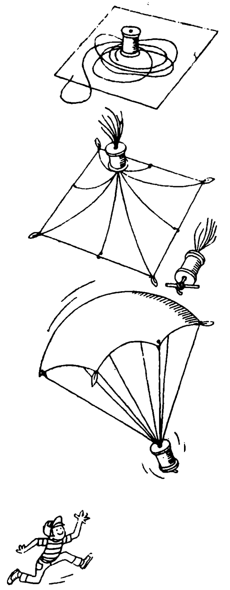

কাগজ কেটে প্যারাস্যুট তৈরি কর

মালা সেন

কি ভাবে করবে ? পাশের ছবিটি দেখ এবার তোমার যা যা প্রয়োজন :

রুমালের সাইজের (চৌকোণা) প্লাস্টিক বা কাপড়ের টুকরো, সুতো, সুতো জড়াবার খালি খোল (রীল)

চৌকোণ টুকরোর চার কোণে ও মাঝখানে প্রায় আধ মিটার লম্বা-৮ (আট) টুকরো সুতো আটকে নাও। [illegible]খোলের (রীলের) ভিতর দিয়ে সুতোর [illegible]য় নাও।

খালি রীল চৌকোণ টুকরোর মাঝখানে ধরে রেখে সুতোর শেষ প্রান্তগুলি একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠির সঙ্গে জড়িয়ে নাও, যাতে সুতোর টুকরোগুলি রীলের গর্ত দিয়ে বেরিয়ে না যায়।

আলতো ভাবে মুঠো করে ধরো, যত উঁচুতে সম্ভব ওপর দিকে ছুঁড়ে দাও।

দেখ, প্যারাস্যুট কেমন ধীরে ধীরে নেমে আসছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকার কর্তৃক মনোনীত কিশোর পাঠ্য

সূচীপত্র

প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা—১৩৯১

॥ ভৌতিক সংখ্যা ॥

রহস্য গল্প

শীতের রাতে ট্রেনে। মানবেন্দ্র পাল / ৪৯

এক টুকরো আকাশ ও মুক্ত। সমীরণ মুখোপাধ্যায় / ৫৯

কমিকস্

মটু দি গ্রেট। মৈত্রেয়ী বিশ্বাস / ৩৫

উপন্যাস

কঙ্কাল দ্বীপ। হিচকক্ / ১১

দুরন্ত তপাই। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় / ৩২

ভূতের বড় গল্প

অলৌকিক একটি ও আমরা। অজয় দাশগুপ্ত / ৪৩

নিশির ডাক। মনোজকান্তি ঘোষ / ৫২

হাসির গল্প

মূর্তিমান। ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় / ৯

কবির কৌতুক। পথিক মণ্ডল / ৬১

বিশেষ রচনা

জীবজন্তুর স্নেহ। উত্তমকুমার দাস / ৭

শব্দ-সন্ধান, ধাঁধা, বুদ্ধির খেলা

শব্দ-সন্ধান। প্রদীপকুমার দত্ত / ৬৫

পিক্চার ওয়ার্ড বুদ্ধির খেলা। বিষ্ণু দত্ত / ৬৬

ধাঁধা। গৌতম ঘোষ / ৬২

বিচিত্রা, খবর, ম্যাজিক

কাগজ কেটে পুতুল। মালা সেন / প্রঃ ২য়

বহু বিচিত্র সংবাদ। বরুণ মজুমদার / ৬৩

ম্যাজিকের মজা। নির্মলকুমার ব্যানার্জী / ৩৪

খেলা, ছবি

মন ছুটে যায় খেলার মাঠে। হান্নান আহসান / ৪

খেলা আর খেলা। জয় গুপ্ত / ৫

ছবি আঁক। সন্ধ্যা বসু / ৬

কথামালা। মীরা বিশ্বাস / ৬৫

সম্পাদক

অমিতাভ সেন

'শুকতারা' নটরাজ প্রকাশনের পক্ষে নির্মল চন্দ্র ব্যানার্জী কর্তৃক ১/সি দুর্গা পিথুরী লেন, কলিকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

মুদ্রণ: ইম্প্রেশন, কলিকাতা-৬
জয়শ্রী প্রেস, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ: নিউগয়া আর্ট প্রেস, কলিকাতা-৯

ব্লক: রয়েল হাফটোন কলি-৭

অলংকরণ: দেবকুমার

শুকতারা: ২৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য: ২·৫০ টাকা। Rs. 2.50

হানূনান
আহসান

ক্রিকেট ধীর স্থির সাবলীল। তুরন্ত ছটফটে। কাউকে হাসায় কাউকে কাঁদায়। ক্রিকেট আবার মহৎ—বড়ো শৃঙ্খলা পরায়ণ। খেলোয়াড়কে সৎ সত্যবাদী কিংবা দয়ালু সহানুভূতিশীলতার চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। ক্রিকেটের এক উজ্জ্বল কর্তব্যপরায়ণ চরিত্র ভিকটর ট্রামপার—একজন আদর্শ খেলোয়াড় বলতে তাই। বড়ো মজার আর অদ্ভুত মানুষ এই ট্রামপার। কেন অদ্ভুত কেন মজার একটা উদাহরণে বোঝা যাবে। মরশুমটা ১৯১০-১১। অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা খেলা বিখ্যাত মেলবোর্ন মাঠে। সারা দেশবাসী ট্রামপারের উপর আস্থাশীল। ট্রামপারই খেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। কিছুক্ষণ পরেই তিনি পার্টনারকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার গোড়াপত্তন করতে নামবেন। এমন সময় সাজঘরের দরজায় টোকা। কে আবার বিরক্ত করতে এলো! কি আর করা যাবে। অত্যন্ত ভদ্র ট্রামপার দরজা খুলে দেখতে পেলেন ব্যাট হাতে এক যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে। কি চাই ভাই? ব্যাটটা ট্রামপারের দিকে এগিয়ে ধরে যুবকটি যা বলতে চাইল তাতে তিনি বিস্মিত বা বিরক্ত না হয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন। আসল ব্যাপারখানা হল, ছেলেটি সম্প্রতি একটি ক্রিকেট ব্যাটের দোকান চালু করেছে। কিন্তু তার দোকানের কোন ব্যাটই প্রায় বিক্রি হচ্ছিল না। তাই ভিকটরকে তার তৈরী [illegible] ব্যাটেই [illegible] খেলিয়ে বিজ্ঞাপনের কাজটা সারতে চায়। কেন বাবা একজন গরীব বেচারা মরে—ভিকটর তক্ষুণি রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু বিপদ দেখা দিল অন্য দিকে। দলের বাদবাকি খেলোয়াড়েরা এমন ঝুঁকি নিতে সাহস পেলেন না। একে ব্যাটটা ওজনে ভারী—তার ওপর তুর্ধর্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলা। তাও আবার দলের গোড়াপত্তনকারী ব্যাটসম্যান তিনি। কি মুশকিল। অবশেষে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঐ ব্যাটটি নিয়েই ভিকটর উইকেটের দিকে ধীর পায়ে এগোলেন। রুদ্ধশ্বাস দর্শক! রুদ্ধশ্বাস যুবক! রুদ্ধশ্বাস আমপায়ারও। ৬৭ রানের এক অসামান্য ইনিংস খেলে বীরের মতো প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন ব্যাটসম্যান। নাম আর শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়ে ব্যাটটি ফেরৎ দিলেন যুবককে। কী সাংঘাতিক চরিত্র এই ট্রামপার! কী সাংঘাতিক তাঁর খেলা।

জয় গুপ্ত

ক্লাইভ হুবার্ট লয়েডের জীবনে ১৯৮৪ স্মরণীয় বছর। এই বছরে তিনি ১০০-র বেশী টেস্ট ম্যাচে অংশ গ্রহণ করলেন। চলতি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ ধরে তিনি খেলেছেন ১০২ ম্যাচ। তাঁর আগে আর মাত্র দুজন ক্রিকেটার ১০০র বেশি টেস্ট খেলেছেন। তাঁরা দুজনেই হলেন ইংল্যাণ্ডের, কলিন [illegible] কাউড্রে ১১৪টি ও জিওফ্রে বয়কট [illegible] খেলেন। লয়েড ১০২ টেস্ট ম্যাচ খেলে ৭০০০ ক্লাবের সম্মানীয় সভ্য হলেন। তাঁর আগে আরো ছজন খেলোয়াড় এই সম্মান লাভ করেছেন। যথাক্রমে তাঁরা হলেন, গাভাসকর, বয়কট, সোবার্স, কাউড্রে, গ্রেগ চ্যাপেল ও হ্যামণ্ড।

এ পর্যন্ত টেস্ট ম্যাচে তিনশর বেশি উইকেট পেয়েছেন মাত্র চার জন। ডেনিস লিলি, বব উইলিস, লানস গিবস ও ফ্রেড ট্রুম্যান। আর মাত্র পাঁচটি উইকেট পেলেই সর্বকালের অন্যতম সেরা অল রাউণ্ডার ইয়ান বথাম ৩০০ উইকেট লাভ করবেন। সম্প্রতি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে লর্ডসে বোথাম অবিস্মরণীয় বোলিং এর নজির রেখে ২৯৫টি উইকেট পেয়েছেন। এই টেস্টে তিনি ১০৩ রানের বিনিময়ে ৮টি উইকেট পেয়েছেন। বহু সমালোচক ধরে নিয়েছিল বোলিং-এ বথামের দেবার আর কিছুই নেই। তাঁরা এই খেলা দেখে অবাক হয়ে গেছেন।

কে বড় অল রাউণ্ডার? এই নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এবার সেই বিতর্কের অবসানের জন্য সমারসেটে পাঁচ জন অল রাউণ্ডারের মধ্যে এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হচ্ছে। সুতরাং এই প্রতিযোগিতা যে খুবই আকর্ষণীয় হবে তাতে সন্দেহ নেই, যদিও বর্তমান বিশ্বের অল রাউণ্ডারদের মধ্যে পাকিস্তানের ইমরান খাঁ তাঁর পায়ের আঘাতের জন্য অংশ গ্রহণ করতে পারছেন না। যাঁরা অংশ নেবেন, তাঁরা যথাক্রমে কপিল দেব (ভারত), ইয়ান বথাম (ইংল্যাণ্ড), রিচার্ড হেডলী (নিউজিল্যাণ্ড), ক্লাইভ রাইস (দক্ষিণ আফ্রিকা) ও ম্যালকম মার্শাল (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)। এই প্রতিযোগীদের প্রচুর অর্থ দেওয়া হবে।

ভারতের অধিনায়ক কপিল দেব এক চিঠিতে ক্রিকেট বোর্ড অব কণ্ট্রোলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য তিনি শারজায় এশীয় কাপ বিজয়ী ভারতীয় দলকে অবশিষ্ট খেলোয়াড় গঠিত দল নিয়ে হারিয়ে দেবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, এশীয় কাপ বিজয়ী দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন

গাভাসকর। অবশিষ্টদের মধ্যে মহিন্দার অমরনাথ, যশপাল শর্মা, অশোক মালহোত্রা, অংশুমান গায়কোয়াড় প্রভৃতি নামী খেলোয়াড়রা রয়েছেন।

ইংল্যাণ্ড দল বব উইলিসকে সরিয়ে ডেভিড গাওয়ারকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন অনেক আশা নিয়ে। যদিও গাওয়ারের অধিনায়কত্বে ইংল্যাণ্ড পাঁচটি টেস্টে শোচনীয়ভাবে হেরে গেছে। গাওয়ার অধিনায়ক হয়ে ব্যাটে চার ইনিংসেই ব্যর্থ হয়েছেন।

ক্রিকেট ছেড়ে ফুটবলের খবরে আসা যাক। এবার ইউরোপীয়ান কাপে ফ্রান্স স্পেনকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। ফ্রান্সের অধিনায়ক মিশেল প্লাতিনি অনবদ্য ফুটবলের নজির রেখেছেন। বলতে গেলে তাঁর ব্যক্তিগত নৈপুণ্যেই ফ্রান্স বিজয়ীর সম্মান লাভ করল। গোল করার দক্ষতায় প্লাতিনি এখন বিশ্বের শিরোনাম। ফ্রান্সের হয়ে তিনিই সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেয়েছেন। ভারত থেকে দুটি দল চীন ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গিয়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য এই দু দলের কোনোটিতেই মনোরঞ্জনের মতো ফুটবলারের স্থান হয়নি। দু জায়গাতেই শোচনীয় ফল করেছে ভারত। বিদেশী কোচ মিলোভানও এই দলকে দিয়ে সুবিধে করতে পারেননি।

ভারতের ফুটবল সিজনের শুরু হয় ফেডারেশন কাপ দিয়ে। এবারে ফেডারেশন কাপে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দল ছিল মোহনবাগান। তারপরে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু এই দুই দলকে টেক্কা দিয়ে বাজীমাৎ করেছে মহামেডান স্পোর্টিং। দলগত সংহতি, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াই তাদের জয়ের কারণ। এই নিয়ে পর পর দুবার মহামেডান স্পোর্টিং ফেডারেশন কাপ জিতল। দুবারই দলের অধিনায়ক সাব্বির আলি। ফেডারেশন ছাড়াও তারা নাগজী গোল্ড কাপ ও নিজাম গোল্ড কাপ জিতেছে। তাঁদের এই কৃতিত্ব সত্যিই মনে রাখবার মতো।- কলকাতায় ফুটবল লীগে মোহন[illegible] কিন্তু মহামাডান স্পোর্টিং আনবিটন [illegible]

ছবি আঁক

নীচের ছবিতে বাঁ পাশের ছবি দেখে ঘর কেটে নাও ছবির উপর, পরে ছবি আঁক। দেখ ঠিক পারবে।

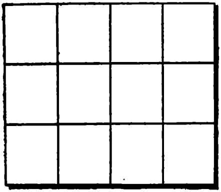

উত্তম কুমার দাস

১৮৭৫ সাল। নৈনিতালের করবেট পরিবারে, ক্রিস্টোফার গার্লি নামে এক সাধারণ সরকারী কর্মচারীর অষ্টম সন্তানের জন্ম হয়। ক্রিস্টোফার গার্লি এই ছেলের নাম রাখলেন এডোয়ার্ড জেমস করবেট। ছেলে বড় হতে লাগল।

এক সময় ক্রিস্টোফার এডোয়ার্ডকে নৈনিতালের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। যদিও তিনি সপরিবারে নৈনিতালের বাড়ি গার্নি হাউস-এ সারা বছর থাকতেন না। তাঁর আরও একটি বাড়ি ছিল, তেহরি রাজ্যের কালাধুঙ্গী নামক ছোটো গ্রামে। যার দূরত্ব নৈনিতাল থেকে ১৫ মাইল। নৈনিতালে তখন খুব শীত পড়ত বলে, তাঁরা কালাধুঙ্গীর বাড়িতে শীতাবাস করতেন।

এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয় বুঝে ফেলেছ, আমি কার কথা বলতে যাচ্ছি? হ্যাঁ, আমি সেই লক্ষ্যভ্রষ্টহীন শিকারী, জিম করবেটের কথাই বলব। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কর্মজীবন শুরু করে, শিকার তো বটেই, আমৃত্যু কোন কাজে যিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। যেন হিংস্র পশু ও প্রশংসা শিকার করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

১৮৯৫ সালে "বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়েতে" সময়-শর্তাধীনে কাজ নিয়ে জিম করবেটের কর্মজীবনে প্রবেশ। তখন রেল এঞ্জিনে কয়লার বদলে কাঠও ব্যবহৃত হত। তাই তাঁর কাজ

ছিল, ভাবরের জঙ্গল থেকে সেই কাঠ কাটানো ও সরবরাহ করা। এই কাজের মেয়াদ প্রশংসার সঙ্গে শেষ করে, তিনি ফুয়েল ইন্সপেক্টর, মাল গাড়ির গার্ড, সরকারী স্টেশন মাষ্টার, সরকারী গুদামের রক্ষক, মোকামাঘাটে ব্রডগেজ থেকে মিটার গেজে মাল চালান প্রভৃতি নানা ধরনের কাজও খুব প্রশংসার সঙ্গে শেষ করেন। এ ছাড়া তাঁর জীবনে ঘটেছে বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা। ১৯০৭ সালে তিনি প্রথম মারলেন নরখাদক, চম্পাবতের বাঘিনী। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে, কুমায়ুন থেকে পাঁচ হাজার সৈন্য রংরুট করলেন। ফ্রান্স ও ওয়াজিরিয়ায় গেলেন, এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মেজর পদে উন্নীত হলেন।

১৯৩৮ সালের "থাক"-এর বাঘিনী জিম করবেটের শেষ নরখাদক শিকার হিসেবে চিহ্নিত, সম্ভবত ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার ফলেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়ে, তিনি ভারতীয় সেনাদের গেরিলা যুদ্ধের তালিম দিলেন, এবং লেফটেনান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হলেন। এর মাঝে অবশ্য তাঁর জীবনে একটা বিষাদময় ঘটনা ঘটে যায় ১৯২৪ সালে। সেটা তাঁর মায়ের মৃত্যু। জিম করবেটের এক অবিবাহিত বোন ছিল। নাম, ম্যাগি। ওঁদের মা মৃত্যুর সময় ম্যাগিকে গার্নি হাউস লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ম্যাগি বাড়িটি পি, কে, বর্মা নামক ব্যক্তিকে বিক্রি করে দিলে, জিম করবেট বোন ম্যাগিকে নিয়ে আফ্রিকার কেনিয়ার অন্তর্গত নিয়েরিতে চলে এলেন। কিন্তু তারপরেই জিমকে নিয়ে চারদিকে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। কেননা, ১৯৪৬ সালে স্বদেশে বসে তিনি "ম্যানইটার্স অফ কুমায়ুন নামে যে বইটি লিখেছিলেন এই সময় তা ছেপে পাঠকদের হাতে আসে। যা পড়ে তারা মুগ্ধ। অথচ জিম করবেটের কোনদিনই লেখক হবার ইচ্ছা ছিল না। সে কথা কোনদিন ভাবেননিও। শুধু বন্ধুদের পিড়াপিড়িতেই লিখতে বসে, লিখেছিলেন এই বইটি।

জীব জন্তুদের প্রতি তার যে স্নেহ, সেটা অনেকেই ভুলে যায়। করবেটের কুমায়ুনের বাঘ পড়লেই বুঝতে পারা যায় বাঘকে মিছিমিছি হিংস্র বলা হয়। বিশের দশকের গোড়ার দিকে, জিম করবেট অরণ্য ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। নিয়েরিতে এসে আন্দোলনে অগ্রগণ্য ভূমিকা নেন। কিন্তু ঐ একটি বই লিখেই আলোড়ন তোলার ফলে, প্রকাশকদের হাত থেকে কোন অবস্থাতেই রেহাই পেলেন না। তাই লিখলেন "ম্যান ইটিং টাইগার অফ রুদ্রপ্রয়াগ।" বইটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হতেই আবার [illegible] শংসা। সুতরাং এর পরেই তাঁর লেখা বহু কাহিনী প্রকাশিত হল। উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে কয়েকটি "মাই ইণ্ডিয়া" (১৯৫২) "জঙ্গল লোর" (১৯৫৩), "দি টেমপল টাইগার এণ্ড মোর মানইটার্স" (১৯৫৪)।

জিম করবেট যে ইতিহাস হয়ে গেছেন, এ তো তোমরা সকলেই জান। সেটা ১৯৫৫ সাল, জিম করবেট "দি ট্রিপল" লেখার মাত্র ১৩ দিন পরেই মারা গেলেন।

জিম করবেট তাঁর প্রথম বইটি ছাড়া, বাকি সব বইগুলির গ্রন্থস্বত্ব অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের কর্মীদের ভোগ করতে দিয়ে গেছেন। কেবল প্রথম বইটির গ্রন্থস্বত্ব দিয়ে গেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে সব সৈনিক দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন তাদের চিকিৎসার জন্য।

●● পুজা সংখ্যায় থাকবে জিম করবেটের একটি শিকার কাহিনী।

৩

অবশেষে ভাইয়ের কথামত বটুরাম তার সিদ্ধান্ত পাল্টায়! শুরুতেই যেখানে মন্দ সেদিকে এগুনো বিপজ্জনক। সে শিক্ষা ভেড়াদের মাধ্যমেই পাওয়া গেল। তবে তাদের জাতিবোধ জ্ঞানের প্রশংসা না করে বটুরাম থাকতে পারে না। ভেড়াদের মধ্যে কিছুতেই ভিড়তে ওরা দিতে চায় না। অন্য কোন দলে ভেড়ে না।

বটুরাম দাদার গায়ে গায়ে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে দাদা, এবার কোথায় যাওয়া যায় বলতো?'

'তাই তো ভাবছি—' বটুরাম থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। 'তোমায় ভাবতে হবে না।' বটুরাম দাদাকে নিষ্কৃতি দিতে চেয়ে বলে, 'তুমি শুধু আমাকে লক্ষ্য রেখো।'

'তোকে লক্ষ্য রাখবো,' বটুরাম বিস্ময়ে ভাইয়ের দিকে নজর ফেলতেই বলে, 'মানে, তুমি শুধু আমার পিছনে পিছনে এসো।'

'বলছিস?' দাদা বটুরাম ভাইয়ের কথায় সায় দেয়।

দু'জনের মুখে আর কোন কথা নেই। বটুরাম লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলে। বটুরাম তার ছোট ছোট পায়ের পদক্ষেপে তাল রাখতে পারে না। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'ওরে বটু, তোর পকেটে নাক খোঁচাবার কাটিটা আছে না? এদিকে একবার দেতো।'

'তোমার কি সবই বিদঘুটে ? শুভ যাত্রার সময় নাক খুঁছিয়ে হাঁচতে শুরু করবে ? ধন্যি তুমি !'

'চোপ !' বটুরামের গলা চড়তে শুরু করে। 'দাদার মুখের ওপর কথা ?'

কোন কথা না বলে বটুরাম পকেট হাতড়ে তার নাক খোঁচাবার কাঠিটা দাদার হাতে গুঁজে দেয়। হাতে পেয়েই নাকের গর্তে সেটাকে ঢুকিয়ে বার কয়েক হেঁচে নিয়ে লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে বলে, তুই আমায় কোথায় নিয়ে চললি বল তো ?'

'ধাপার পথে।'

'ধাপা ?'

হ্যাঁ দাদা, মানুষ যা অবহেলা করে, যে পদার্থের কোন কদর বোঝে না, অথচ সেথায় রয়েছে সোনার পাহাড়—'

'সেখানে তুই সোনা দেখলি কোথায় ? যত রাজ্যের জঞ্জালের স্তূপ।' বটুরাম হতবাক হয়ে দাড়িয়ে থাকে।

'দাদা, আমি তোমায় বলেছি না, আমি কিছু একটা আবিষ্কার করতে চাই। অতএব—'

'জঞ্জালের পাহাড়ে ?' বটুরাম শুধিয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ দাদা। ওখানেই আমার আবিষ্কার।'

'আমি আর এক পা এগুতে চাই না। বাড়ির পথে চললাম !'

ওটুরাম দাদাকে বাধা দিয়ে বলে, 'আচ্ছা দাদা, একবার চলই না। ওই জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে মহামূল্য ধন তো খুঁজে পেতে পারি যা আমাদের জীবনে একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে।'

বটুরাম ভাবতে থাকে। ওটুরাম কথাটা মন্দ বলে নি। কপালে কি আছে, কে বলতে পারে। পারুক আর ছাই নাই পারুক ওটুরাম কিছু একটা করতে চায়। কি চায় সেই জানে ! বটুরাম ভাবতে বসে, ওটুরামের পাল্লায় পড়ে, এ যাত্রায় ফিরে আসবো কি বা কে জানে !

ওটুরামের যুক্তিতে সায় দিলেও বটুরাম বলে, 'আমার তো আবার অ্যাজমা আছে তুই জানিস। জঞ্জালের স্তূপের সামনে যাওয়া কি উচিত ?'

'তোমার তো নাক বুজে থাকে। বীজাণু ঢোকবার উপায় থাকবে না।' ওটুরাম যুক্তি খাড়া করতে চায়।

কথায় কথায় পা ফেলতে ফেলতে যথাস্থানে হাজির হয় দুজনে। আকাশ ছুঁই ছুঁই জঞ্জালের স্তূপের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে, শহরে এত জঞ্জাল সৃষ্টি করে মানুষ ?

বিস্ময়ে বটুরাম ভাইকে জিজ্ঞেস করে ওরে, 'হ্যারে ওটু, এত জঞ্জাল তুই ঘাঁটবি কি করে ? সারা জীবন ধরে ঘেঁটেও তুই কিনারা করতে পারবি না।'

'পারবো দাদা পারবো।' ওটুরাম তার সিদ্ধান্তে অটল। বলে, 'এই পৃথিবীতে কি কেনা যায় আর কিই বা অপ্রয়োজনীয় ? আমি তোমায় বলে রাখছি দাদা, তোমার ওটু মুখ উজ্জ্বল করবে। মানুষ যা ভাবতে পারে না, আমিই তা ভাবিয়ে ছাড়বো।'

'তোর পাগলামীতে আমিই যখন ভেবে জ্বলছি—' কথাটা আর শেষ করা গেল না। কোথা থেকে একটা দিশি কুকুর কাছে এগিয়ে এসে বটুরামকে শুঁকতে থাকে। বটুরাম নাক সিঁটকে দু হাত পিছিয়ে যায়। ওটুরাম বলে ওঠে, 'ভয় করো না। এরা এখানকার বাসিন্দা। তাছাড়া ওদের সংগে ভাল ব্যবহার না করলে কাজের ব্যাঘাত হতে পারে। কাছে এগিয়ে এসে তুমি বরং ওকে একটু আদর কর।'

'ছাই করবে।' বটুরাম বিরক্ত হয়ে বলে, 'আমাকে তুই ভেবেছিস কি ? যা বলবি তাই করতে হবে ?' ঠিক আছে, আমি চললাম।

এক

একটা বিশাল সাদা-ডানা ঈগল পাখির মতন উড়ে চলেছে—সিলভার এয়ার লাইন্সের একখানা বিমান। পশ্চিম থেকে পুবে। সেই প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে বন জঙ্গল পাহাড়-পর্বত, শহর-গ্রাম পার হয়ে উড়ে এসেছে অতলান্তিক মহাসাগরের তীরে।

—ওই দেখ কঙ্কাল-দ্বীপ! বলে উঠল বব এ্যান্ড্রুজ।

—কই! কই···দেখি। আমাকে একটু দেখতে দাও।

যেন একটা করোটি।

—মানচিত্রে যেমন দেখেছি ওই দেখ দ্বীপটার তেমনি চেহারা।

তিনশ' বছর আগে ওই কঙ্কাল দ্বীপে ছিল জলদস্যুদের ডেরা। হয়ত তারা তাদের লুঠ করা ধন-সম্পদ ওখানে লুকিয়ে রাখত। তাই দ্বীপটা ঘিরে গড়ে উঠেছে রহস্যের জাল।

আরও একটা ছোট দ্বীপ নজরে পড়ল।

—ওই দ্বীপটা হচ্ছে হাত।

—আর ওই দূরে কাছে ছোট ছোট জল-ঘেরা পাহাড়গুলো মনে হচ্ছে হাড়।

রোমাঞ্চকর গা ছম ছম করা কিশোরদের জন্য রহস্য-ঘন উপন্যাস লিখেছেন: অ্যালফ্রেড হিচকক ক্ষুদে অনুসন্ধানীরা জলদস্যুদের আস্তানা কিভাবে উদ্‌ঘাটন করেছে।

জুপিটার ও পেটি ববকে সরিয়ে বিমানের জানলা দিয়ে তাকাল, দেখলো কঙ্কাল-দ্বীপ।

সঙ্কীর্ণ অতলান্তিক উপসাগর।

বিমান বাতাসে ভর করে ধীরে ধীরে নামছে। আর ঠিক তার নীচে একটা বিচিত্র-দর্শন দ্বীপ—বব বলল—দেখছ তো, ওই হাতের মতন দ্বীপটা সত্যিই যেন মানুষের একখানা হাত। ছোটখাট টিলাগুলো এক একটা আঙুল। বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

—জান, দৈনিক পত্রে পড়েছি কঙ্কাল-দ্বীপের কথা।

... ... আছে। জুপিটার বলল। এবারে সত্যিকারের রোহোল দেখব। বিমান ধীরে ধীরে বন্দরে নামল।

ওরা বিমান থেকে নেমে পড়ল।

—তোমার বাবা, নিশ্চয় আমাদের নিতে আসবে! বলল বব। জবাব দিল পেটি—লিখেছেন, কাজের চাপে নিজে না আসতে পারলে অন্য কাউকে পাঠাবেন।

বব আস্তে আস্তে বলল—দেখত ওই ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের খুঁজছেন। একজন লোক ওদের দিকে এগিয়ে এল। কুতকুতে দু'চোখের দৃষ্টি মেলে বলল—তোমরা তিনজনেই বোধ হয় হলিউডের ডিক্টেটিভ, তাই না? কিন্তু তোমাদের দেখে তা' মনে হয় না। তোমাদের বয়স আরও বেশি হবে ভেবেছিলাম।

বব দেখল জুপিটার কঠিন হয়ে উঠেছে।

আমরা সবাই অভিনেতা। একখানা ছবিতে অভিনয় করব। ডিটেকটিভ নই।

লোকটা ওদের দিকে শুধু চোখ নাচাল।

-যাক গে চলে এস! আমি গাড়ি এনেছি। আর একখানা গাড়ি তোমাদের মালপত্র নিয়ে যাবে। এই বিমানে হলিউড থেকে কত্ত জিনিস আনা হয়েছে। লোকটার সঙ্গে ওরা বিমান বন্দরের বাইরে এল।

একখানা পুরোনো আমলের স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়েছিল।

-ওঠ, ওঠ। গাড়িতে উঠে পড়। আজও ঝড় হবে।

আকাশের দিকে তাকাল বব।

চাঁদ রয়েছে—সূর্য অস্তগামী। কিন্তু পশ্চিম আকাশে কাল মেঘের ঘনঘটা—ছুটে আসছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেন ছুটন্ত মেঘের হাতে বিদ্যুতের চাবুক।

বিমান বন্দর ছেড়ে গাড়ি ছুটল।

জুপিটার জানতে চাইল—মাপ করবেন··· আপনার নাম!

—সবাই আমাকে স্যাম বলে···।

সহসা সারা আকাশ মেঘে ঢাকা পড়ল।

—আপনি কি মুভি কোম্পানীর চাকুরে?

—না। তবে তোমাদের পৌঁছে দেব বলেছি। ওই দেখ ঝড় শুরু হয়ে গেল।

নাগরদোলার পেত্নীকে আজ রাতে দেখা যাবে। কঙ্কাল দ্বীপে রাতে আমি কিছুতেই বেরোব না।

নাগরদোলার পেত্নী!

উত্তেজনার শিহরণ বয়ে গেল ববের মেরুদণ্ড দিয়ে। কঙ্কাল-দ্বীপের পেত্নীর কাহিনী। এ সেই পাগলী স্যালি ফ্যারিঙটনের পেত্নী। বছর পঁচিশ আগে সে পুরানো ঘোড়া-দোলনায় চড়েছিল। আর তখনই সহসা দারুণ ঝড় উঠেছিল। ঘোড়া-দোলনা ছেড়ে সবাই ভয়ে পালিয়েছিল—কিন্তু পালায় নি স্যালি। ও ঘোড়া-দোলনার ঘোড়ায় চেপে ঘুরতেই লাগল।

উঠুক ঝড়। আমি নামব না, পালাব না নাগর-দোলা ছেড়ে।

—তুমি পালাও। পালাও এখুনি। বলেছিল ঘোড়া-দোলনার চালক।

—আগে আমার ঘুরন্তি শেষ হোক, তবে নামব!

আর তখনই বাজ পড়ল ঘোড়া-দোলনার মাথায়। সবাই বলাবলি করতে লাগল—নিজের দোষেই মারা গেল স্যালি।

তারপরই শুরু হল ভৌতিক কাণ্ড কারখানা। দিন সাতেক পরের ঘটনা।

ঝড় আসছে। কঙ্কাল-দ্বীপের প্রমোদ উপবন ছেড়ে সবাই চলে গেছে মেন ল্যাণ্ডে; ঝড়ের

দামামা শুরু হল।

সহসা সবাই শুনতে পেল, প্রমোদ-উপবনে বাজনা বাজছে। দেখল, ঘোড়া-দোলনার মাথায় আলো জ্বলে উঠেছে। আর ঘুরতে শুরু করেছে ঘোড়া-দোলনা। ঘুরছে···আর ঘুরছে। সেই ঘুরন্ত দোলনায় চড়েছে একটি মূর্তি। তার সাদা পোশাক উড়ছে।

কে ওই মেয়ে?

কেন? স্যালি ফ্যারিঙ্গটন! এই ঝড়ের রাতে তার ঘূর্ণন শেষ করছে।

প্রমোদ-উপবনের মালিক মিস্টার উইলবার একদল লোক পাঠালেন ওখানে ভৌতিক কাণ্ড-কারখানা দেখে আসার জন্যে। ওরা ঘোড়া-দোলনার খুব কাছে গিয়েও দেখল, ঘোড়ায় রয়েছে একটা ভৌতিক শরীর।

সহসা প্রমোদ-উপবনের সব আলো নিভে গেল। উধাও হল পেত্নী-শরীর। থামল বাজনার সুর আর ঘোড়া-দোলনার ঘূর্ণন। শুধু মাটিতে পড়ে আছে একখানা রুমাল—তার এক কোণায় দুটো অক্ষর লেখা—এস এবং এফ। তার মানে এ রুমাল স্যালি ফ্যারিঙ্গটনের।

শহরের তামাম মানুষের মনে ভয় ছড়িয়ে পড়ল। ভৌতিক ভয়। শহরের লোক ছুটির দিনে প্রমোদ-উপবনে যাওয়া বন্ধ করল। নাগর-দোলা আর ঘোড়া-দোলনায় জং ধরল। সেই থেকে প্রমোদ-উপবন রইল পড়ে। মাঝে মাঝে জেলেরা দেখতে পেত ঝড়ের রাতে স্যালি ফ্যারিঙ্গটন ঘোড়া-দোলনায় ঘুরছে। আলো জ্বলছে—বাজনা বাজছে। সহসা আবার সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

স্যাম বলল—শুনেছি সিনেমা কোম্পানীর লোকেরা আবার ঘোড়া-দোলনা সারাচ্ছে। ভালই হবে, স্যালির পেত্নী খুব খুশী হবে। হয়তো এবার ও ঘূর্ণন শেষ করতে পারবে।

ওদের গাড়ি তিন রাস্তার সংযোগ স্থলে এসে পড়ল।

শহর ফিসিঙ্‌ পোর্ট—দু'মাইল। পাশে তীর চিহ্ন আঁকা।

স্যাম্‌ সে রাস্তা ছেড়ে পাশের রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে দিল।

—এ কি শহরের রাস্তা ত ওদিকে। এদিকে গাড়ি আনলেন কেন মিস্টার স্যাম্‌? পেটি জানতে চাইল।

—দরকারে যাচ্ছি। মিস্টার ক্রেনশ' বলেছেন সোজাসুজি তোমাদের ওই দ্বীপে নিয়ে যেতে। কি একটা গোলমাল হয়েছে। তাই নিয়ে যাচ্ছি।

কি গোলমাল হয়েছে?

ওরা নীরবে ভাবতে লাগল।

বালি ঢাকা রাস্তায় লাফতে লাফাতে গাড়ি এসে থামল সমুদ্রের তীরে একটা পরিত্যক্ত জেটির ধারে। একখানা ভাঙা-চোরা জেলে নৌকা বাঁধা। ঢেউয়ে দুলছে নৌকোখানা।

—তাড়াতাড়ি নৌকোয় ওঠ! ঝড় আসছে! স্যাম তাড়া দিল।

ওরা নৌকোয় উঠলে স্যামও নৌকোয় লাফিয়ে উঠে পড়ল।

—আমাদের মাল-পত্তর কখন আসবে? জুপিটার জিজ্ঞাসা করল।

স্যাম নৌকোর মোটর চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বলল—পরে আসবে।

ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নাচতে নাচতে নৌকো চলতে লাগল।

বৃষ্টি এল। রিম্‌-ঝিম্‌ বৃষ্টি শেষ হয়ে বড় বড় ফোঁটা ঝরতে লাগল।

তিনজনে একখানা ক্যানভাসের নীচে গুঁড়ি মেরে

বসেছিল।

—আমরা এবার জলে ডুববো দেখছি। ওরা বলল।

বারবার আকাশ ছিন্নভিন্ন করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল—বাজের হুঙ্কার ছড়িয়ে পড়ছিল।

সামনেই নজরে পড়ল ডাঙ্গা। ছুচলো পাহাড়ী জমি।

—ওহে, তোমরা নেমে পড়। আমরা এসে গেছি। স্যাম চেঁচিয়ে উঠল।

তিন ক্ষুদে অনুসন্ধানী হতভম্ব হয়ে পাথুরে ডাঙ্গায় লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু কই স্যাম নামল না তো? নৌকো আবার ডাঙ্গা ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন?

—একি? আপনি নামলেন না, স্যাম?

—ডাঙ্গা দিয়ে হাঁটতে থাক। ক্যাম্পে পৌঁছে যাবে ঠিক।

—দ্বীপে একটা কিছু আছে। চল ত দেখি! বলল জুপিটার!

ওরা ক্ষুদে দ্বীপের মাঝামাঝি সরে এল।

সহসা আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। আর তার আলোয় ওরা পরিষ্কার দেখতে পেল গোটা দ্বীপটা। ছোট-বড় পাথরের চাঁইতে ভরা। দ্বীপের মাঝ বরাবর একটা পাথরের কুঁজ। আর সেই কুঁজের মাথা থেকে জল ছিটকে বেরিয়ে আসছে। আর বিকট আওয়াজ উঠছে···হু···হু···শ্।

জুপিটার বলে উঠল—আরে এযে দেখছি একটা ফোয়ারা। নীচে পাথরের কোনও ফাটল দিয়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় জল উপরের ফাটল দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসছে। এটা নিশ্চয় ব্লোহল। আমরা তাহলে কঙ্কাল-দ্বীপে নেই, আছি হাত-দ্বীপে।

তিনজনে হতাশ ভাবে পরস্পরের দিকে তাকাতে

তিন ক্ষুদে অনুসন্ধানীকে পাথুরে ডাঙ্গায় নামিয়ে স্যাম নৌকা নিয়ে যাচ্ছে কেন?

গর্জন করে সজোরে ছুটল মোটর-বোট—অচিরে ঝড়ো রাতে অদৃশ্য হল।

ওরা তিনজনে মাথা নীচু করে বৃষ্টির ছাট থেকে বাঁচতে চেষ্টা করল।

—চল রাস্তার খোঁজ করি। পেটি চেঁচিয়ে বলল। জুপিটার মাথা নাড়ল!

···হু হু···হুশ্।···হু···হু···হু···শ্।

থেমে থেমে একটা বিকট আওয়াজ ভেসে আসছে। যেন গর্জে উঠেছে একটা জানোয়ার।

লাগল।

স্যাম ওদের এই নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে পালিয়েছে। কিন্তু তার কারণ ওরা জানে না। ঝড়ের রাতে এই হাত-দ্বীপে ওরা পরিত্যক্ত। সারা রাত চেঁচালেও কেউ ওদের সাহায্য করতে আসবে না।

দুই

একখানা ঝুলন্ত পাথরের নীচে ওরা তিনজনে বসেছিল।

বৃষ্টি থেমে গেছে। ওরা সারা দ্বীপ ঘুরে এসেছে। দেখে এসেছে স্বাভাবিক জলের ফোয়ারা। জুপিটার বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে। ফোয়ারার কারণ ওদের বুঝিয়ে দিয়েছে। দ্বীপের এই কুঁজটার মাথা থেকে একটা ফাটল নেমে গেছে একদম নীচ পর্যন্ত। আর সমুদ্রের ঢেউয়ের জল আছড়ে পড়ে সেই ফাটলের ভিতরে। আর অমনি জল ছিটকে বেরিয়ে আসে উপর দিয়ে।

মুখ থেকে বৃষ্টির জল মুছতে মুছতে পেটি বলল — স্যাম আমাদের ফেলে গেল। কিন্তু কেন গেল বুঝতে পারছি না ত?

বব বলল—ও হয় ত এই দ্বীপকে কঙ্কাল-দ্বীপ বলে ভুল করেছে।

মাথা নাড়ল জুপিটার—না, কখ্খনো না। ও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের ফেলে গেছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না কি করে ও জানলো যে আমরা রহস্যভেদী। আমরা অনুসন্ধান করতে আসছি।

—আমরা এখন এই দ্বীপে না খেয়ে মরবো হয় তো! পেটি বলল।

—আজ রাতটুকু কাটাতে পারলে সকালে কারো নজরে আমরা নিশ্চয় পড়ব দেখো! জেলেরা নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে আসে। ওরাও আমাদের সাহায্য করবে!

বব উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল—এদিকে সমুদ্রের ঝিনুকের মধ্যে এক ধরনের বিষাক্ত পরগাছা জন্মাচ্ছে তাই জেলেদের নৌকো আর ঝিনুক ধরতে আসে না। ঝিনুকের এই রোগের জন্যে ফিসিঙপোর্ট শহরও কানা হয়ে গেছে। জেলেরা এখন বড় গরীব।

জুপিটার বলল—সিনেমা কোম্পানীর লোকেরা আমাদের না দেখতে পেয়ে খোঁজ করতে করতে এদিকে এসে পড়বে। কাজেই সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া ওদের আর কোনও পথ নেই।

ওরা তিনজনে বসে বসে ঘুমে ঢুলছিল।

সহসা পেটির দু'চোখ ছেড়ে ঘুম পালাল। ভাবতে লাগল ও কোথায় আর এখানে কেনই বা এসেছে। ওদের ত এখন মিসেস বার্টনের বাড়িতে থাকবার কথা! তার বদলে এই সাগর-দ্বীপে তারা পরিত্যক্ত!

ঝড় থেমে গেছে। আকাশ-ভরা তারার জোনাকি। আর দূরে একটা আলো জ্বলছে। কেউ তাদের খুঁজছে। ওই ত আলোটা তাদের দিকে ঘুরল। পেটি গা থেকে রেন-কোট খুলে নাড়তে শুরু করল।

—এই যে আমরা এখানে! এখানে! চেঁচিয়ে উঠল।

দোলায়মান রেনকোটের উপর আলোর শিখা পড়ল। অনুসন্ধানকারী তাদের দেখতে পেয়েছে। এগিয়ে আসছে নৌকোখানা। ওই ত তীর বরাবর ওখানা আসছে। ছোট্ট পাল-তোলা নৌকো।

—নৌকোখানা বোধ হয় ওখানে থামছে। ও চায় আমরা ওখানটায় যাই।

—ভাগ্য ভাল যে আকাশে তারা উঠেছে।

—দেখ, মাঝি আমাদের সাহায্য করতেই চায়! বব বলে উঠল।

আলোর শিখা মাটিতে এসে পড়ল—ঠিক ওদের সামনে।

পথ দেখাচ্ছে।

ওরা তিনজন এগিয়ে চলল।

একখানা ক্ষুদে পাল-তোলা নৌকো বালির চড়ায় টেনে তোলা। পাল নামানো। একটা ছোকরা —গায়ে হাওয়া-রোধী জামা, পরনের ট্রাউজার হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। দাঁড়িয়ে আছে সে বালির

চড়ায়। ওদের মুখের উপর দিয়ে সে হাতের টর্চের আলো বুলিয়ে নিল। ঝকঝকে গায়ের রঙ, একমাথা কালো কোঁকড়া চুল—আর জ্বলজ্বলে দু'চোখে তাদের দেখছে।

ভিনদেশী। তাই ওর কথায় একটা বিশেষ ধরনের টান।

—এই, তোমরাই বুঝি সেই তিনজন ডিটেকটিভ ?

তাহলে সবাই তাদের পরিচয় জেনে ফেলেছে।

প্রায় পেটির মতন লম্বা, চওড়া বুক আর পেশীবহুল হাত। বলল—আমি ক্রিস মারকোস। পুরো

ক্রিস নৌকোয় পাল তুলল।

নৌকো হাওয়ার বেগে ছুটল।

এবার নিজের কথা বলতে লাগল ক্রিস : ভূমধ্য-সাগরের তীরে গ্রীসে বাবার সঙ্গে বাস করতো। ওর বাবা ছিলেন ডুবুরি। সাগরে ডুব দিয়ে স্পঞ্জ তুলে আনতেন। তার মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। গ্রীসের ডুবুরিরা সাগরে ডুব দিয়ে স্পঞ্জ তুলত। ওদের কোনও পোশাক-টোশাক লাগতো না—স্রেফ ডুববার জন্যে একখানা বড় পাথর লাগতো। ওর বাবাও ছিলেন পাকা

দেখ, মাঝি আমাদের সাহায্য করতে চায়! ওরা তিনজন এগিয়ে চলল।

নাম ক্রিসটোস্ মারকোস। তোমরা ক্রিস বোলো।

খুশি খুশি ভাব ছেলেটিকে দেখেই ওদের ভাল লাগল। পেটি বলল—ক্রিস্ জানলে কি করে আমরা এখানে আছি ?

—সে অনেক কথা। এখন নৌকোয় ওঠ। এখুনি শহরে যেতে হবে। সিনেমা কোম্পানীর লোকেরা খুব ঘাবড়ে গেছে! বলল ক্রিস্।

ওরা নৌকায় উঠল।

—তুমি সিনেমায় কাজ কর বুঝি ?

—না, আমি কাজ করি না। ক্রিস নৌকো ঠেলে জলে নামাতে নামাতে বলল। তারপর এক লাফে নৌকোয় উঠে পড়ল। হাওয়ার দিক বদলেছে।

ডুবুরি।

তারপর ওর বাবার কোমরে বাত হল। সব ডুবুরিদের কাছে এটা মারাত্মক রোগ। আর গভীর জলে ডুব দেওয়া সম্ভব ছিল না। রোজগার বন্ধ হল। ক্রিসের এক মামাতো ভাই ফিসিঙপোর্টে ঝিনুকের ব্যবসা করে। সে টাকা পাঠাল ওদের এখানে চলে আসার জন্যে।

বাবার সাথে ক্রিস ফিসিঙপোর্টে চলে এল।

ঝিনুক শিকার করে ওদের দিন ভালই চলছিল। কিন্তু সমুদ্র-ঝিনুকের রোগ হতেই ওদের রোজগার বন্ধ হল। ক্রিসের মামাতো ভাই নিউ ইয়র্কে চলে গেল। হোটেলে এখন কাজ করে। কিন্তু

ক্রিসদের সংসার অচল। ও একটা কাজ চায়। কিন্তু ভিনদেশী সে—কেউ তাকে কাজ দিতে চায় না।

সাগর ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নৌকোখানা এগিয়ে চলেছে।

প্রেটি জিজ্ঞাসা করল—আমরা এখন কোন জায়গায় এসেছি বল তো? আর তুমি এই আঁধারে পথ চিনছ কি করে? ডুবো পাথরে লেগে নৌকোখানা গুঁড়িয়ে যেতে পারে।

খুশি খুশি গলায় জবাব দিল ক্রিস—ঢেউ ভাঙ্গার শব্দে আমি বুঝতে পারি কোথায় ডুবো পাথর আছে না-আছে। ওই দেখ, ওইগুলোকে হাড়-দ্বীপ বলে। আরও দূরে বাঁ দিকে কঙ্কাল দ্বীপ।

ক্ষুদে সন্ধানীরা কঙ্কাল দ্বীপ দেখার জন্যে তাকিয়ে রইল।

পনের শ' পঁয়ষট্টি সালে ইংরেজ নাবিক-সেনানী ক্যাপটেন হোয়াইট কঙ্কাল দ্বীপ আবিষ্কার করেন। পূর্বে এই দ্বীপে রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের মৃতদেহ সমাধি দিত। অনেক হাড়গোড় পড়েছিল। আর দ্বীপটাকে দেখতেও ছিল একটা কঙ্কালের মতন। তাই ক্যাপটেন হোয়াইট নাম দিয়েছিলেন কঙ্কাল-দ্বীপ। আর প্রায় একই সময় হাতের মত দেখতে দ্বীপটাও আবিষ্কার করে তিনি নামকরণ করেছিলেন—হাত-দ্বীপ।

পাল তুলে দিয়ে ওদের নৌকা হাওয়ার বেগে ছুটল।

এরপর শুরু হল জলদস্যুদের আনাগোনা। গরমের সময় ওরা এই দ্বীপে ডেরা বাঁধত। আর এখান থেকেই মেনল্যাণ্ডে সোনার খোঁজে যেত। নাম-করা ইংরেজ জলদস্যু 'ব্ল্যাক বিয়ারড' এক বছর এই দ্বীপের আস্তানায় ছিল।

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ নৌ-বাহিনীর সঙ্গে জলদস্যুদের লড়াই শুরু হল। জলদস্যুদের খতম করার জন্য চলল রক্তক্ষয়ী

সংগ্রাম।

শেষ সংগ্রাম হল জলদস্যু ক্যাপটেন ওয়ান ইয়ারের সাথে।

ইংরেজ নৌ-বাহিনী সহসা এক রাতে কঙ্কাল-দ্বীপে ক্যাপটেন ওয়ান ইয়ারের আস্তানায় হানা দিল। লড়াই চলল, এক সময় ক্যাপটেন তার লোক-জনদের দ্বীপে ফেলে সোনা দানা নিয়ে একখানা নৌকোয় চেপে পালাল।

ইংরেজ বাহিনী তাকে তাড়া করল। শুধু ত জলদস্যুদের খতম করলেই হবে না—তাদের লুঠ করা সোনা·দানা গুলোও কেড়ে নিনে হবে। হাত-দ্বীপ ঘিরে তাই নতুন করে লড়াই চলল। একে একে সব জলদস্যু মারা পড়ল। ক্যাপটেন ওয়ান-ইয়ার ধরা পড়ল আহত অবস্থায়।

কিন্তু সোনাদানা আর স্প্যানিশ স্বর্ণমুদ্রা ডাবলুন-গুলো কই? লোহার সিন্দুকগুলোও শূন্য। ক্যাপটেন ওয়ান-ইয়ার বলল—যক্ষপুরীর রাজার হাতে সব স্বর্ণমুদ্রা। উনি নিজে না দিলে ওগুলো তোমরা কেউ পাবে না। যক্ষপুরী ভাঙ্গলে সব পাবে।

এমন কি ফাঁসির আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ক্যাপটেন ওয়ান-ইয়ার একই কথা বলল। কঙ্কাল দ্বীপ ঘোর আঁধার ঢাকা। ওরা কিছুই দেখতে পেল না।

জুপিটার বলল—এখানে সমুদ্রে তুমি ঘুরে বেড়াও, তাই জল কল্লোলের শব্দে সব চিনতে পার।

—ঘুরে তো বেড়াই। মাঝে মাঝে সাগর জলে ডুব দিই। সমুদ্র তলে সোনা ছড়ানো আছে, তাই খুঁজি।

—সোনা পেয়েছ? জানতে চাইল পেটি।

বারেক দ্বিধায় পড়ল ক্রিস। তারপর বলল—পেয়েছি। তবে খুব সামান্য।

—কি ভাবে পেলে ক্রিস? জুপিটার জিজ্ঞাসা করল।

—এই ত গত সপ্তাহে পেয়েছি। ঠিক কোন জায়গায় পেয়েছি বলব না। জান ত, এক জন যা জানে তা' গোপন কথা। দু'কান হলে সে আর গোপন থাকে না। আর তিন কান হওয়ার অর্থ সারা সংসারময় চেঁচিয়ে বলা। বুঝেছ! মাথা নামাও, পাল ঘুরছে।

পাল ঘুরল। নৌকো সামান্য কাত হয়ে মুখ ঘোরাল।

তারপর ছুটল বন্দরের আলোর দিকে।

সহসা ওরা পিছন ফিরে দেখল, ঘোড়া দোলনার মাথায় আলো জ্বলে উঠেছে। বাজনা বাজছে। আর একটা ঘোড়ায় চড়ে একটা সাদা মূর্তি যেন ঘুরছে বন্ বন্ করে।

স্যালি ফেরিঙ্গটনের পেত্নী ঘোড়া দোলনায় ঘুরছে। নৌকো ফিসিঙপোর্টের কাছে পৌছল।

তিন

দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ হল।

—ছেলেরা উঠে পড়। সকালের খাবার দেওয়া হয়েছে। মিস্টার ক্রেনশ' তোমাদের জন্য বসে আছেন! দরজার ওপাশ থেকে মিসেস বার্টন বললেন। ওরা নীচের তলায় খাবার ঘরে নেমে এল।

চমৎকার হলুদ-রঙ খাবার-ঘর। দেওয়ালে নানা ধরনের সামুদ্রিক জন্তু জানোয়ারের ছবি। খাবার দেওয়া হয়েছে টেবিলে। দু'জন ভদ্রলোক একান্তে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন আর কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন।

ক্ষুদে অনুসন্ধানীরা খাওয়া শুরু করল।

পেটির বাবা মিস্টার ক্রেনশ' বেশ মোটা। বললেন—কাল কি হয়েছিল বল ত।

মিস্টার ক্রেনশে'র সঙ্গে কথা বলছিলেন পুলিশের

দারোগা নস্‌টিগন সাহেব। জুপিটার রাতের ঘটনা সব বলল।

মিস্টার ক্রেনশ' জিজ্ঞাসা করলেন—এই স্যাম লোকটা কে বলতে পারেন ?

পুলিশ চীফ্ নস্‌টিগন জবাব দিলেন—মনে হচ্ছে স্যাম রবিনসন! খুব ভালভাবে চিনি। বার কয়েক জেলও খেটেছে। টাকার জন্যে সব কিছু করতে পারে। ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

মিস্টার ক্রেনশ' বললেন—লোকটা জানল কি করে ওরা অনুসন্ধানী। এবং এই তিনজনকে ও নির্জন দ্বীপে ফেলেই বা এল কেন ? ক্রিস্ ছোকরা উদ্ধার না করলে আমরা আজকালের আগে ওদের খুঁজেই পেতাম না!

পুলিশের দারোগা স্বীকার করলেন।

মিস্টার ক্রেনশ' আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা ওই ক্রিস ছোকরা কি করে এত তাড়াতাড়ি তোমাদের খুঁজে পেল। ওর কাছ থেকে শুনেছ কিছু ?

ওরা মাথা নাড়ল। না, ওর কাছ থেকে ওরা সে-সব কিছু শোনে নি।

—তোমরা কাল রাতে নাকি পেত্নী দেখেছ ? কিন্তু তা' ত অসম্ভব। ঘোড়া-দোলনার পেত্নী ত স্থানীয় লোকদের কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু না! বললেন পেটির বাবা।

চীফ নস্‌টিগন বলে উঠলেন—কিন্তু এখানকার লোকেরা তাই বিশ্বাস করে। গত কয়েক বছর ধরে অনেক ছেলে ওই পেত্নীকে দেখেছে। তাই কঙ্কাল দ্বীপের ধারে কাছে আর কেউ যায় না! রাতে শহরের বহু লোক ঘোড়া-দোলনার পেত্নীকে দেখেছে। একটা সাদা পোশাক পরা মূর্তি দোলনায় ঘুরছে বাজনা বাজছে। আলো জ্বলছে। তাই সবাই বিশ্বাস করে, হতভাগিনী স্যালি ফারিঙ্গটনের পেত্নীর কথা মিথ্যে নয়।

—ব্যস! তাহলে ছবির কাজ দেখছি বন্ধ হয়ে যাবে। আজ আর কেউ কাজ করতে আসবে না। বললেন মিস্টার ক্রেনশ'।

—আজ কাল কেন কোনদিনই ওরা কাজ করতে আসবে না মিস্টার ক্রেনশ'। দেখি, স্যামকে ধরে এখন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করি। কাল রাতে ক্রিস্ ছোকরা কি করে এদের খুঁজে পেল জানতে হবে ? চীফ নস্‌টিগন বললেন।

মিস্টার ক্রেনশ' বললেন—ছোকরা আমাদের কাছে কাজের খোঁজে এসেছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকদের ধারণা, ও চোর ছাঁচোড়। আমাদের নানা সমস্যার পিছনে হয়ত ওর হাত আছে।

পেটি বলল—না বাবা। ক্রিস্ খুব ভাল ছেলে। ওর বাবা অসুস্থ। ক্রিস্ দেখাশোনা করে। আর নৌকো নিয়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় রত্নের সন্ধানে।

চীফ বলে উঠলেন—আমারও তাই বিশ্বাস। ভিনদেশী বলেই লোকে ওর নিছক বদনাম করে।

মিস্টার ক্রেনশ' বললেন—আমাদের জিনিসপত্র চুরি করে ওর পক্ষে বিক্রি করা সম্ভব নয়। তবে এটা আমার ধারণা! চল আমরা এখন কঙ্কাল দ্বীপে যাব! পরিচালক মিস্টার ডেন্টন আজ আসছেন।

আরও কিছুক্ষণ পরে ওরা একখানা দ্রুতগামী মোটর বোটে চড়ে কঙ্কাল দ্বীপে নামল। ফিসিঙ-পোর্ট থেকে মাইল খানেক দূরে দ্বীপের অবস্থান। চারিধারে গাছ-গাছড়ার জঙ্গল। উত্তরদিকে একটা পাহাড়। প্রমোদ উপবনের প্রায় আর কিছুই চোখে পড়ে না।

দ্বীপের দক্ষিণ দিকে একটা পুরানো জেটিতে একখানা বড় মোটর বোট বাঁধা।

সমুদ্র-গভীরে ডুবুরির কাজে এ ধরনের মোটর-বোট ব্যবহার করা হয়।

মিস্টার ডেন্টন ওদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলেন।

বললেন—এক সপ্তাহের মধ্যে যদি নাগর-দোলাটা ঠিক না করা যায় তবে এই দ্বীপ ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে। জায়গাটার নৈসর্গিক দৃশ্য খুবই মনোহর! কিছু ছবি এখান থেকে তুলে নিলেই হবে।

—এক সপ্তাহের মধ্যে নাগরদোলা বানানো যাবে। ছুতোররা আজ আসবে? মিস্টার ক্রেনশ' বললেন।

—আসবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাল রাতে আবার পেত্নীর আবির্ভাব হয়েছিল; শহরের সবাই তা' জানে।

—ওই পেত্নীকে আমি ধরবই!

পাশে দাঁড়িয়েছিল দারোয়ান টম্ ফ্যারাডে। পিপের মতন তার বুক। বাম হাতখানা কঠিন আর অনড়। কোমরে একটা বন্দুক। লোকটা এগিয়ে এসে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল—সার, কালরাতের পেত্নীর জন্যে আমি দায়ী।

সবাই ওর দিকে তাকাল।

চার

টম ফ্যারাডে বলল—কাল রাতে আপনারা সবাই ছেলেদের খোঁজে মেনল্যাণ্ডে চলে গেলেন। তারপর ঝড় এল। আমি দ্বীপে একা ছিলুম। একখানা মোটর-বোটের আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এলুম। এবং এবং দেখলুম, ঘোড়া-দোলনার কাছে একজন লোক ঘোরাঘুরি করছে। ওর দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা পালাল। জিনিসপত্র সব ঠিক আছে কি-না জানবার জন্যে আমি ঘোড়া-দোলনাটা চালিয়ে দিলাম। ব্যস, বাজনা বাজল, ঘোড়া-দোলনা ঘুরল। বুঝতে পারলুম যে, চোর কোনও যন্ত্রপাতি চুরি করতে পারে নি।

মিস্টার ক্রেনশ' বলে উঠলেন—পেত্নী কোথা থেকে এল?

—আমি একটা হলুদ-রঙের রেন-কোট পরে ছিলাম। দূর থেকে ওটাকে সাদা দেখাচ্ছিল।

—টম আজই তুমি মেন-ল্যাণ্ডে গিয়ে এসব লোককে বল। যেন কাজের লোকের জন্যে আমাদের সমস্যা না দেখা যায়। লোক জোগাড় করে আনবে। সৎ লোক, যারা আমাদের জিনিস পত্র নিয়ে পালাবে না।

—তাই করছি, সার! বলল টম্।

মিস্টার ক্রেনশ' বললেন—এই স্যাম রবিনসন্ জানল কি করে যে, ছেলেরা ডিটেকটিভ।

টম ফ্যারাডে বলে উঠল—আপনারা যখন ফোনে মিস্টার হিচককের সঙ্গে কথা বলছিলেন ছেলেদের সম্পর্কে তখন কেউ ফোনে আড়ি পেতে শুনেছে। এ শহরে অনেকেই ফোনে আড়ি পাতে।

মিস্টার ক্রেনশ' রেগেমেগে বললেন—ও! আচ্ছা জায়গা ত এই কঙ্কাল-দ্বীপ! হলিউডে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি।

মিস্টার ডেন্টন মোটর-বোটে চলে গেলেন মেন-ল্যাণ্ডে।

—চল, দ্বীপটা তোমাদের ঘুরে দেখাই। বললেন মিস্টার ক্রেনশ'।

কিছুটা হাঁটার পর ওরা প্রমোদ-উপবনের ভাঙা বেড়ার ধারে হাজির হল। সব কিছুর ভগ্ন অবস্থা। পুরানো নাগর-দোলাটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে বটে তবে তার খানকয়েক তক্তা ঝুলে পড়েছে। ছেলেরা মস্ত বড় ঘোড়া-দোলনাটা দেখছিল। সিনেমার লোকেরা এটা সারিয়ে রঙ করেছে।

মিস্টার ক্রেনশ' ওদের কাছে সিনেমার গল্প বললেন।

—আমরা আরও একটু ঘুরে দেখব, বাবা! পেটি বলল।

—হাঁ, দেখতে পারো। তবে জেফ মর্টন এখুনি ফিরে আসবে। তোমাদের ডাইভিং শেখাবে। মিস্টার ক্রেনশ' বললেন।

খানিকটা পথ গিয়ে উনি থেমে বললেন—দেখ, যাই করো ধনরত্ন খুঁজতে যেও না। এটা এককালে জলদস্যুদের আস্তানা ছিল।

বব বলল—জানি, বইতে জলদস্যুদের ধনরত্নের আর ক্যাপটেন ওয়ান-ইয়ারের কাহিনী পড়ছি।

—কতবার লোকে এই দ্বীপের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে দেখেছে। ধনরত্নের আশায় দলে দলে লোক এসেছে। কিন্তু একটাও স্পেনীয় মুদ্রা এখানে পাওয়া যায় নি। তবে তোমরা খুঁজে পেলে আমি অবাক হব না। হাসতে হাসতে বললেন মিস্টার ক্রেনশ'।

বব বলল—আমরা পাহাড়ের ওই গুহাটা দেখে আসব? মানচিত্রে ওই গুহাটা দেখান আছে। জলদস্যুরা বন্দীদের ওই গুহায় আটকে রাখত মুক্তি পণ আদায় করার জন্যে! কিন্তু ওখানেও কেউ কখনও ধনরত্ন পায় নি!

মিস্টার ক্রেনশ' বললেন—যাও, কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এস।

উনি চলে গেলেন।

ক্ষুদে অনুসন্ধানকারীরা পাহাড়ের দিকে হাটতে লাগল।

একসময় বব জিজ্ঞাসা করল—জুপি তুমি কোনও কথা বলছ না? কি ভাবছ বল ত?

পহেলা নম্বরের অনুসন্ধানীকে খুব চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল। জুপিটার বলল—দেখ পেটি, তোমার বাবা এবং অন্যান্যরা বলেন যে, জেলেরা চুরি-চামারি করছে। আমি তা' বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস কর না? তোমার কি বিশ্বাস?

জুপিটার বলল—এই যে গোপনে নৌকো এবং যন্ত্রপাতি চুরি করছে তার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে সিনেমা কোম্পানীকে কঙ্কাল-দ্বীপ থেকে তাড়ানো। বিগত পঁচিশ বছর ধরে এই দ্বীপ পরিত্যক্ত পড়ে আছে। কারো উদ্দেশ্য এটা এমনিভাবে থাকুক। ইচ্ছে করেই সে এইসব ক্ষয়ক্ষতি করছে যাতে মিস্টার ডেন্টন তাঁর ছবি তোলার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

—সিনেমা কোম্পানীকে তাড়াতে চাইছে? তারা থাকা না থাকায় কার স্বার্থ আছে?

—সেটাই ত রহস্য? চল এখন গুহাটা দেখে আসি। বলল জুপিটার।

পাহাড়ী পথে গাছ-গাছড়া পেরিয়ে ওরা গুহার সামনে এসে হাজির হল। গুহার মুখটা সঙ্কীর্ণ আর ভিতরটা আঁধারে-ঢাকা। ওরা ভিতরে ঢুকল। কয়েক মুহূর্ত পরে অন্ধকার ওদের দৃষ্টিতে সহজ হল। দেখল, গুহাটা একটা ঘরের মতন। পিছন দিকটা আবার সঙ্কীর্ণ হয়েছে। গুহার মেঝে মাটির। এবড়ো-খেবড়ো খোঁড়া। রত্নের খোঁজে এই মাটির মেঝে বহুবার খোঁড়া হয়েছে।

কোমরবন্ধে বাঁধা টর্চটা হাতে নিয়ে জ্বালল জুপিটার।

আলো পড়ল গুহার শেষদিকে একখানা চওড়া পাথরের উপর। সমতল পাথরখানা বেশ মসৃণ—বন্দী মানুষগুলো হয়ত ওই পাথরের উপর শুয়ে থাকত। পাথরখানার উপর একটা ছোট্ট গর্তের উপর আলো ফেলে চমকে উঠল জুপিটার।

পাথরের তাকের উপর একটা গোলাকার সাদা বস্তু।

মানুষের করোটি। তাদের দেখে যেন হাসছে। জলদস্যুদের রেখে যাওয়া করোটি।

সহসা করোটি কথা বলল—পালাও। আমাকে বিশ্রাম করতে দাও। এখানে কোনও গুপ্তধন

নেই। আছে শুধু আমার শুকনো হাড়।

পাঁচ

আপনা থেকেই পিছন ফিরে বব ছুট দিল। ছুটল পেটিও। গুহার মুখে ওদের ঠোকাঠুকি হল। হাতের টর্চটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, সেটা কুড়িয়ে নিয়ে জুপিটারও ওদের অনুসরণ করল। গুহার বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

জুপিটার বলল—দেখ, মড়ার করোটি কখনও কথা বলতে পারে না! কথা বলতে হলে চাই জিহ্বা আর বাগযন্ত্র। কাজেই ওই করোটি কথা বলে নি।

বব আর পেটি হতভম্ব হল—লজ্জিত হল।

ওরা দেখল ক্রিস্ মারকস গুহার দেওয়াল বেয়ে নীচে নামছে। পুরোনো করোটিটা পিছনে লুকিয়ে বলল—আমাকে চিনতে পারছ ত!

জুপিটার বলল—হাঁ চিনতে পারছি। আমি সন্দেহ করছিলাম একাজ তোমার। একখানা নৌকো আমাদের আগে আসছিল, ওখানা তোমার। তাছাড়া কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছিল কোনও বালক কথা বলছে।

ক্রিস্ বলল—তোমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছি, বল? তোমরা ভেবেছ মৃত জলদস্যু কথা বলছে।

জুপিটার জবাব দিল—আমি চমকে গেছি কিন্তু বব আর পেটি ভয় পেয়েছে। বব আর পেটি লজ্জিত হল।

—আমরা ভয় পাই নি। ভয় পেয়েছে আমাদের পা-গুলো। বব বলল।

জুপিটার জানতে চাইল—তুমি এখানে কি করে এলে ক্রিস্? আর গুহার মধ্যে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলে কেন?

ক্রিস্ বলল—দেখলাম তোমরা আসছ দ্বীপে। আমি দ্বীপের অন্য দিকে বালির চড়ায় নৌকো তুলে নেমে পড়লাম। গাছ-গাছড়ার ভিতর দিয়ে এসে দেখলাম তোমরা ঘোড়া-দোলনার কাছে দাঁড়িয়ে আছ। তোমরা বললে গুহা দেখতে যাবে। ব্যস্! আমি আগেই গুহায় এসে লুকিয়ে রইলাম।

—তুমি লুকোলে কেন? আমাদের কাছে আগেই এলে না কেন?

—তোমাদের দারোয়ান টম্ ফ্যারাডে আমাকে দেখলেই তাড়া করে। সবাই আমাকে তাড়িয়ে দেয়! সরলভাবে বলল ক্রিস্। ওর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। দুঃখ ম্লান-কণ্ঠে বলতে লাগল—জান, শহরে আমার খুব বদনাম। লোকে ভাবে, আমি চোর। আমি ত ভিনদেশ থেকে এসেছি। অথচ শহরে অনেক বদ্ লোক আছে। তারা চুরি ক'রে। বলে গ্রীক ছোকরা ক্রিস চুরি করেছে। কিন্তু আমি চুরি করিনা।

পেটি বলল—আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি!

—জান, বিলের পান্থনিবাসে ঝাঁট দি, কাপ-ডিশ ধুই। রোজ দু'ডলার করে পাই। ওতেই আমার আর বাবার খরচ চলে যায়। মিস্টার বিল চমৎকার লোক।

—রোজ মাত্র দু'ডলার! ওতে কি করে খরচ চালাও!

—জেলেদের একখানা ভাঙা-চোরা কুঁড়েতে থাকি। সিম সিদ্ধ আর রুটি খাই। আর রোজ অনেক মাছ ধরি। কিন্তু বাবার শরীর খারাপ তাই তাঁর জন্যে ভাল খাবার জোগাড় করতে হয়। বাড়তি সময়ে আমি সাগরে ঘুরে বেড়াই রত্নের খোঁজে। সোনা আছে সাগরের তলদেশে পড়ে। কিন্তু আমি ক্রিস মারকস্ আমার কি ভাগ্যি যে আমি তা খুঁজে পাব?

—আরও পাঁচজনের মতন তুমিও পেতে পার?

কিন্তু কোথায় আমরা আছি কাল জানলে কি করে ?

—ডিস্ ধুচ্ছিলাম কাল। শুনলাম কোণের ঘরে কয়েকজন বলাবলি করছে। তিনজন ক্ষুদে ডিটেকটিভ আসছে। একজন বলল—ওদের আমি মজা দেখাচ্ছি। এমন হাতেনাতে শিক্ষা দিয়ে দেব যে, ভুলতে পারবে না। তারপর ওরা হেসে উঠল।

জুপিটার বলল—ক্রিস্ ওরা হাত কথাটার উপর কখন জোর দিল ?

—হাত কথাটা ও বিশেষভাবে উচ্চারণ করেছিল, তাই না ?

—হাঁ, হাঁ। লোকটা বার বার হাত কথাটা বলছিল। তারপর শুনলাম তিনটে ছেলে হারিয়ে গেছে। কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে ওদের ? মনে পড়ল ওদের বলা 'হাত কথাটা।

—তুমি বুঝতে পারলে যে, ওরা হাত-দ্বীপের কথা বলছে তাই না ?

—কাজেই ঝড় থামতেই নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সোজা হাত-দ্বীপে চলে এসে তোমাদের পেলাম। কিন্তু সিনেমার লোকেরা আমাকে বিশ্বাস করে না। ক্রিস্ বলল।

—কিন্তু আমরা তোমাকে বিশ্বাস করেছি, ক্রিস্ !

তেল-চিটে একটা চামড়ার থলে বার করে বলল—সবাই তোমরা হাত বাড়াও ত ! এবং না বলা পর্যন্ত দেখবে না।

ওরা তিন জনেই হাত বাড়াল।

ক্রিস্ ওদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা গরম বস্তু দিল। ওরা তাকিয়ে দেখল ঝকঝকে গোলাকার সোনার পিণ্ড। পুরোনো মুদ্রা।

সব দেখে-শুনে বব বলল—ষোল শ' পনের সালের মুদ্রা।

জুপিটার খুশি-ভরা গলায় বলল—স্পেনদেশীয় মুদ্রা ডাবলুনস্। এ সেই জলদস্যুদের স্বর্ণমুদ্রা।

—কোথায় এসব পেলে, বন্ধু ? জানতে চাইল পেটি।

—জলের তলায় বালির মধ্যে। অনেক বছর আগে ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ার জাহাজ থেকে তার সব ধন-রত্ন সাগরে ঢেলে দিয়েছিল। এখন সে-সব সাগরের নীচে ছড়িয়ে আছে। খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমি সাগর জলে ডুব দিয়ে ধনরত্ন খুঁজি। একটা পেয়েছি কঙ্কাল-দ্বীপের কাছে। ওখানে মনে হয় আরও আছে। বলল ক্রিস্।

ঠিক তখুনি একটা চিৎকার শুনে সবাই চমকে উঠল।

অ্যাই ক্রিস্। তুই এখানে কি করছিস্ !

ওরা মুখ তুলে দেখল, দেখতে-ভালমানুষ দারোয়ান টম ফ্যারাডে ছুটে আসছে। রাগে তার সারা মুখ কালো হয়ে গেছে।

ফের তোকে এখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে মজা বুঝিয়ে দেব !

টম ফ্যারাডে দাঁড়াল।

ওরাও দেখল, ক্রিস্ ম্যাকরস একটা পাহাড়ের আড়ালে পালিয়ে গেছে।

ছয়

টম ফ্যারাডে জিজ্ঞাসা করল—ওই ছোকরা কি চাইছিল ? ও তোমাদের এখানে এসেছিল কেন ?

জুপিটার জবাব দিল ও কিছু চাই নি। আর ও আমাদের এখানে আনে নি।

—তবে শুনে রাখ ক্রিস্ ছোকরা ভাল না। ওকে অবশ্য কেউ চুরি করতে দেখে নি কেননা ও দারুণ চালাক। ওর সঙ্গে মিশো না। এস., জেফ. মর্টন ফিরে এসেছেন। তোমাদের উনি ডাইভিং শেখাবেন।

ওরা হাঁটছিল টমের সঙ্গে।

টম বলতে লাগল—তোমরা বোধ হয় গুহার মধ্যে গুপ্তধন খুঁজছিলে। কিন্তু ওখানে কিছু নেই। জলদস্যুদের ধনরত্ন সব সাগরের তলায় ছড়ানো আছে। অনেক কাল আগে কিছু কিছু সমুদ্রের তীরে বালির মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। এখন আর পাওয়া যায় না। লোকে আর তাই খোঁজাখুজি করে না।

খানিক থেমে ও আবার বলল—জান, যক্ষরাজা যে ধন একবার নেয় সে আর সহজে ফেরত দেয় না। দশ বছর আগে এক লক্ষ মার্কিন ডলার যক্ষরাজা আত্মসাৎ করেছিল, তা শুনেছ? হাঁ, দখল করে আর ফিরিয়ে দেয় নি। আর ওই এক লাখ ডলারের জন্যই আমার বাম হাতখানা চিরকালের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেছে!

টম নিজের অক্ষম বাম হাতখানা ওদের দেখাল।

ওরা তিনজনই ডলার-খোয়ানোর কাহিনী জানতে চাইল।

—আমি তখন একখানা আর্মার্ড-কারের রক্ষী। গাড়িখানা ডলার ডেলিভারি কোম্পানীর। আমাদের কাজ ছিল স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলো থেকে ক্যাশ সংগ্রহ করে মেলভিলের জাতীয় ব্যাঙ্কে পৌঁছে দেওয়া। কখনও কোনও বিপদ হবে তা আমরা ভাবি নি। আমাদের গাড়ি কখনও এক রাস্তায় যাতায়াত করত না। আর নির্দিষ্ট কোনও সময়ে ব্যাঙ্কে যেত না! টম থামল।

—তারপর!

—ঠিক দশ বছর আগে ফিসিঙপোর্টের ব্যাঙ্কের কাজ সেরে আমরা এক রেস্তোরার কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে নামলাম। গাড়ি ভালভাবে তালাবদ্ধ করা ছিল। অমি আর চালক খেয়ে বেরোচ্ছি, ছু'জন মুখোস পরা লোক একখানা গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল। ওদের একজন চালকের পায়ে গুলি করলো। আমি ওদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই আমার মাথায় মারল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে। মাথায় আঘাত লাগতেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

ওরা মন দিয়ে টম ফ্যারাডের কাহিনী শুনছিল।

—ডাকাতরা আমার পকেট থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে আর্মার্ড কারে উঠে পালাতে চেষ্টা করল। এখন পুলিশ চীফ নসটিগন্ তখন ছিল সামান্য একজন পেট্রলম্যান। ডাকাতদের দেখে গুলি করল। একজন ডাকাতের হাতে গুলি লেগেছিল। আর্মার্ড কার নিয়ে সরে পড়ল। চারিধারে পুলিশ পেট্রল ছড়িয়ে পড়ল। টাকা লুঠের খবর জানিয়ে দেওয়া হল। ডাকাতরা গাড়ি ফেলে একখানা পুরোনো মোটর-বোটে চড়ে জলপথে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু মোটর-বোটের এঞ্জিন গেল খারাপ হয়ে। ডাকাতরা ডলার ঢেলে দিয়েছিল সমুদ্রে। উপকূল রক্ষী বাহিনীর হাতে 'ধরা পড়ল ছুজন ডাকাত—বিল আর জিম বালিনগর। ডলারের থলে শূন্য আর জিমের হাতে গুলির ক্ষত-চিহ্ন। কাগজের ডলার সব জলের নিচে কাদায় আর বালিতে নষ্ট হয়ে গেল।

পেটি জিজ্ঞাসা করল—বেলিনগারদের জেল হয়েছিল?

—কুড়ি বছরের জেল হয়েছিল। কিন্তু সৎ-আচরণের জন্যে মেয়াদ কমে হয় দশ বছর। কয়েক সপ্তাহ আগে ওরা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। আমার বাম হাত ভেঙ্গে দেওয়া জন্যে এবার আমি ওদের শাস্তি দেব! বলল টম ফ্যারাডে।

ওরা সমুদ্রের ধারে জেটিতে হাজির হল।

মিস্টার ক্রেনশ' বললেন—যাও তোমরা। জেফ্

মর্টন তোমাদের স্কিনডাইভিং শেখাবেন।

উনি চলে গেলেন।

মোটর বোটে চড়িয়ে মর্টন ওদের বার-সমুদ্রে একটা হলুদ-রঙের বয়ার কাছে আনলেন। মোটর-বোট নোঙর করলেন।

—তোমরা ডাইভিঙের পোশাক পরে নাও। প্রথমে বব আমার সঙ্গে জলে নামবে।

ওরা ডাইভিঙের পোশাক পরে নিল। মাথায় হেলমেট আর কাঁচ-আঁটা মুখোশ, পিঠে গ্যাস্ সিলিণ্ডার। দু'পায়ে পাখনার মতন ফ্লিপার। কোমরে ডাইভিঙ বেল্ট।

জেফ মর্টন বললেন—এখানে পঁচিশ ফুট জলের নীচে একখানা স্পেন দেশীয় জাহাজ ভেঙ্গে পড়ে আছে। না, জলদস্যুদের জাহাজ নয়। আমরা এখানে ডুব দেব।

জেফ মর্টনের সঙ্গে বব জলে নামল।

সাত

বব জল থেকে উঠে এল।

পেটি জিজ্ঞাসা করল—কেমন লাগল?

জবাব দিল বব—খুব ভাল না। দড়িতে পা জড়িয়ে গিয়েছিল।

এবার পেটির পালা। পোশাক পরে তৈরি ছিল পেটি।

জেফ মর্টনের সঙ্গে পেটি জলে নেমে ডুব দিল।

বব ওর অভিজ্ঞতার কথা বলছিল—এর পরের বার যখন জলে নামব তখন আরও সাহস থাকবে মনে। মুখের মাস্ক ঠিক রাখার জন্যে শান্ত থাকব।

জুপিটার ওর জবাব দেওয়ার আগে শুনল কে যেন ওদের দূর থেকে ডাকছে। শ'খানেক গজ দূর থেকে ক্রিস্ ম্যাকরসের পাল-তোলা নৌকো ওদের দিকে ভেসে আসছে।

একদম মোটর-বোটের ধারে এসে ক্রিস্ তার নৌকো লাগাল—পাল নামাল। ওর চক্‌চকে মুখে সাদা দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ করছিল।

কিন্তু পরক্ষণে ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বলল—ওই টম্ ফ্যারাডে আমার সম্পর্কে তোমাদের কাছে অনেক কথা বলছিল। তোমরা নিশ্চয় সেসব বিশ্বাস করনি!

বব দৃঢ়স্বরে বলল—না ক্রিস্। আমরা ওসব কথা বিশ্বাস করি নি। মোটর-বোটের পাশটা ধরে ও নিজের নৌকোটা থামিয়ে রেখেছিল। বলল—শুনে খুশি হলাম।

ক্রিস্ ডুবুরির দামী দামী নানা ধরনের পোশাক আর যন্ত্রপাতিগুলো দেখছিল। বলল—ওই ভাঙা জাহাজখানা পর্যন্ত ডুব দিতে তোমাদের এত যন্ত্রপাতি লাগছে কেন? আমি ত এমনি যেতে পারি। জান, আমি সত্যিকারের স্কিন-ড্রাইভার।

—আচ্ছা একথা কি সত্যি গ্রীক স্পঞ্জ-শিকারীরা কোনরকম ডুবুরীর পোশাক না পরেই এক শ' ফুট গভীরে ডুব দিতে পারে? বব জিজ্ঞাসা করল।

ক্রিস্ গর্বভরে জবাব দিল—নিশ্চয়, খুব সহজে। আমার বাবা যুবক বয়সে শুধু একখানা পাথর নিয়ে দু'শ ফুট গভীরে নামতে পারতেন। সঙ্গে একটা দড়ি থাকত। দড়ি ধরে তাঁকে টেনে তোলা হত। জান, তিনি পুরো তিন মিনিট শ্বাস বন্ধ করে জলের নীচে থাকতে পারতেন। কিন্তু বড় বেশী জলে ডুব দিতেন তাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু একদিন আমি ধন-রত্ন খুঁজে পাব নিশ্চয়। তখন বাবাকে নিয়ে দেশে ফিরে যাব। নিজে একজন জেলে হব।

ওরা ক্রিসের স্বপ্ন-ভরা মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

ক্রিসের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল—চলি। ডুব দিয়ে সোনা খুঁজব। তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি, কাল যাবে? সোনা না পাওয়া

গেলেও অন্বেষণে অনেক মজা আছে।

বব বলল—দারুণ মজা হবে। কোনও কাজ না থাকলে যাব!

জুপিটার বলল—সিনেমা কোম্পানীর কিছু কাজ হয় ত করতে হবে। কিংবা ডাইভিং অভ্যাসও করতে হতে পারে! বলতে বলতে জুপিটার সজোরে হাঁচল।

—একি তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে জুপি? বব বলল।

ক্রিস্ সাবধান করে দিল—ঠাণ্ডা লাগলে সমুদ্র জলে

জেফ মর্টন এবং জুপিটার জলে ডুব দিল।

এক সময় পেটি উত্তেজিত স্বরে ডাকল—বব, আন্দাজ করত কি?

—কি? বব জানতে চাইল।

—মনে হচ্ছে; উঠে আসবার সময় আমি বালির মধ্যে একটা চকচকে বস্তু দেখে এসেছি। ভাঙা জাহাজখানার কাছ থেকে ফুট পঞ্চাশ দূরে ওটা পড়ে আছে। ওটা নিশ্চয় সোনার ডাবলুন। এবার জলে নামলে আমরা ওটার খোঁজ করব।

ওরা তিনজন দেখল ঝকঝকে গোলাকার সোনার পিণ্ড। পুরানো মুদ্রা। স্পেনদেশীয় মুদ্রা ডাবলুনস্ (স্বর্ণমুদ্রা)

ডুব দিও না, কানের পর্দার ক্ষতি হবে! কাল তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

তার নৌকোয় পাল তুলল ক্রিস্। মোটর বোটের ধার থেকে নৌকোখানা সরে গেল। তারপর রোদভরা উপসাগরের বুক চিরে তার নৌকো তর্ তর্ করে এগিয়ে গেল।

আরও কিছুক্ষণ পরে পেটি আর জেফ মর্টন জলের উপরে উঠল।

এবার জুপিটারের পালা। সে তৈরী হয়েছিল। জলে নামল।

—তুমি ঠিক বলছ?

—পুরো নিশ্চিত নই। তবে একটা উজ্জ্বল বস্তু দেখেছি। ওটা ডাবলুন হতে পারে। এখানকার লোক ত বলে সমুদ্র গর্ভে স্বর্ণমুদ্রা ছড়ানো আছে।

বব একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল—কিন্তু দেওয়া হল না।

জেফ মর্টন এবং জুপিটার জলের উপর ভেসে উঠল।

জুপিটারকে মোটর-বোটে উঠিয়ে দিলেন জেফ মর্টন।

—কি হয়েছে ? বব জিজ্ঞাসা করল।

—না, সাংঘাতিক কিছু হয় নি। জুপিটারের ফেস মাস্ক খুলে গিয়েছিল। তবে ওর বাতাসের নলটা খোলেনি। জেফ মর্টন বললেন।

জুপিটার বলল—ডুব দেওয়ার সময় আমার কানে আঘাত লাগল হাঁচি এল। ফেস্-মাস্ক সরিয়ে হাঁচলাম। আর ঠিক জায়গায় ফেস-মাস্ক লাগাতে পারলাম না। আবার হাঁচলাম।

বলতে বলতে জুপিটার আবার হাঁচল।

বিশাল সমুদ্র গর্ভ—ছোট ওই বস্তুটা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

শেষবার পেটি জল থেকে উঠে এল। ডান হাতের মুঠো কঠিন ভাবে বদ্ধ। মোটর-বোটে উঠে সে তাড়াতাড়ি তার পোশাক আর ফেস-মাস্ক খুলে ফেলল। মুঠো খুলে বলল—দেখ!

ওর হাতের তালুতে ক্ষয়ে-যাওয়া ঝকঝকে গোলাকার একটা মুদ্রা—বেশ বড় আর ভারি!

জেফ বলে উঠল—আরে! এ ত ডাবলুন।

পেটি শেষবার জল থেকেউঠে এল। ডান হাতের মুঠে কঠিন ভাবে বদ্ধ।

জেফ বলল—তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে। জলে ডুব দেওয়া উচিত হয় নি আজ। এখন কয়েকদিন আর ডুব দেবে না।

এর পর পেটি আর বব বেশ কয়েকবার জলে ডুব দিল।

পেটি বালির মধ্যে ঝকঝকে একটা বস্তু পেয়েছে দেখতে—কি ওটা ? ওটা কি সোনার ডাবলুন ? প্রত্যেকবার জলে ডুব দিয়ে ওরা তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেছে। কিন্তু সেটা আর চোখে পড়ে নি।

তারপর হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে আবার বলল জেফ মর্টন—সতের শ' বারো সালের মুদ্রা! স্পেনদেশীয় ডাবলুন। দেখ পেটি, এই মুদ্রার কথা তোমার বাবা ছাড়া আর কাউকে বলবে না।

পেটি ঘাবড়ে গেল। বলল—কেন বলব না ? কেউ কি এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে ?

—না। যা পেয়েছ তা তোমার। কারণ এটা তুমি সমুদ্র-গর্ভে পেয়েছ। এখানকার লোকেরা রত্নের স্বপ্ন দেখে সুখ পায়। ওরা জানে কঙ্কাল

দ্বীপে এবং তার কাছে কোন সোনা-রত্ন কিছুই পাওয়া যায় না। এখন তুমি একটা ডাবলুন পেয়েছ শুনলে সব রত্ন-সন্ধানী দল বেঁধে হানা দেবে। আমাদের ছবি তোলার কাজ শেষ হয়ে যাবে। বলল জেফ মর্টন।

আট

খানিক আগে মিস্টার ক্রেনশ চলে গেছেন।

তিনি বলেছিলেন—ঘোড়া-দোলনার ভৌতিক কাহিনী সহরের সব লোক বিশ্বাস করেছে। কেউ কাছে আসছে না। টম ফ্যারাডে অবশ্য সকলকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু তার কথা তারা বিশ্বাস করছে না। এদিকে ছুতোর চাই। দেখি, অন্য কোনও জায়গা থেকে ছুতোর আনতে হবে।

উনি চলে যাওয়ার পর তিন ক্ষুদে সন্ধানী ঘরের দরজা বন্ধ করে ডাবলুনটা নিরীক্ষণ করতে লাগল। জলদস্যুদের লুঠ করা একটা একদম আসল স্বর্ণমুদ্রা ওরা কুড়িয়ে পেয়েছে—ওদের আনন্দ আর উত্তেজনা তাই বাধা মানে না। হয়ত আর কোনও একটাও ওরা পাবে না—তা' না পাক। এই একটাতেই ওরা দারুণ খুশি।

পেটির বালিশের নীচে ডাবলুনটা রেখে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে মিসেস বার্টনের ডাকে ওদের ঘুম ভাঙল।

—প্রাতরাশ খেয়ে নেবে চল। মিস্টার ক্রেনশ তোমাদের জন্যে বসে আছেন। বললেন মিসেস বার্টন।

ওরা পোশাক পরে তৈরী হয়ে নীচে নামল।

মিস্টার ক্রেনশ বললেন—দেখ, তোমরা নিজেরাই আজ ঘুরে বেড়াও। আমি আজ ব্যস্ত থাকব। জুপিটার তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে আজ আর ডাইভিঙে যেও না। আমি ডকটর উইলবারকে ফোন করে দিচ্ছি। তুমি গিয়ে দেখা করে এসো। ডকটরকে ফোন করে মিস্টার ক্রেনশ চলে গেলেন।

ছেলেদের প্রাতরাশ শেষ হল।

পেটি বলল—এই জুপি, তুমি বিছানা নিলে! আমরা ভাবছিলাম, মোটর-বোটখানা চেয়ে নিয়ে আজ আমরা খুব ঘুরব!

জুপিটার শান্তস্বরে বলল—ভালই হয়েছে। আমাকে কঙ্কাল-দ্বীপের ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে। এই দ্বীপের সঙ্গে একটা রহস্য জড়িয়ে আছে, কিন্তু রহস্যটা যে কি তা ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

মিসেস বার্টন ঘরেই ছিলেন। সহসা চেঁচিয়ে বললেন—কঙ্কাল দ্বীপের কথা বলছ। সে ত সাংঘাতিক জায়গা। ওখানে ঘোড়া-দোলনায় আবার সেই পেত্নী ঘুরছে।

জুপিটার তখন টম ফ্যারাডের কথা বলল।

—ভৌতিক ব্যাপারটা বাজে কথা, ম্যাডাম!

—কিন্তু সবাই ত ওই পেত্নীর কথা বলছে বাপু। আর ধোঁয়া যেখানে এত, আগুন ত সেখানে থাকবেই!

মিসেস বার্টন চলে গেলেন।

জুপিটার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—দেখ, মিসেস বার্টনের মত লোকদের অন্ধ বিশ্বাস সহজে দূর করা যায় না।

ঠিক তখনি জানলায় টোকা দেওয়ার আওয়াজ হল।

ওরা ঘুরে দেখল একখানা মসৃণ মুখ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

—ক্রিস্! বলতে বলতে দরজা খুলতে গেল বব।

—আমি রত্ন-শিকারে যাচ্ছি। যাবে নাকি তোমরা? বলল ক্রিস্।

বব বলল—সত্যি! পেটি আর আমি যাব। জুপি যাবে না, ওর ঠাণ্ডা লেগেছে।

—চারজনের পক্ষে নৌকোটা বড় ছোট। তোমরা বন্দরে এস। আর ডুবুরির পোশাক সঙ্গে এন।

ক্রিস তাড়াতাড়ি চলে গেল।

সব শুনে পেটি উৎসাহিত হয়ে উঠল।

—এবার আমি আর একটা ডাবলুন পাব, দেখবে! চল বব যাই!

বব জবাব দিল—চল। কিন্তু জুপি যাবে না, দুঃখ হচ্ছে।

জুপিটার বলল—তোমরা দু'জনে যাও। পরে দেখা হবে।

—আমরা লাঞ্চের আগেই ফিরে আসব।

ডুবুরির পোশাক নিয়ে বব আর পেটি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওরা তাড়াতাড়ি বন্দরের দিকে হাঁটতে লাগল। ক্রিস ওখানে তার ছোট্ট নৌকো খানা বেঁধে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ওরা ক্রিসের নৌকায় চড়ে জলদস্যুদের সোনার খোঁজে সাগরে ভাসল।

জুপিটার কঙ্কাল-দ্বীপ সম্পর্কে ববের নোট এবং পত্র-পত্রিকাগুলো নিয়ে পড়াশুনা করতে লাগল। এসব পড়ে আর ভেবে ও কঙ্কাল-দ্বীপের আসল রহস্য জানতে চেষ্টা করবে।

মিসেস বার্টন পেটির বিছানাটা ঠিক করার সময় বালিশের তলা থেকে স্বর্ণমুদ্রাটা পেলেন। বলে উঠলেন—এটা ত দেখছি পুরোনো স্পেনীয় মুদ্রা। তোমরা এটা কাল কঙ্কাল-দ্বীপে পেয়েছ, তাই না?

—এটা পেটি পেয়েছে কঙ্কাল-দ্বীপের কাছে সমুদ্র-গর্ভে। জুপিটারের এসব কথা বলবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মিসেস বার্টন স্বর্ণমুদ্রাটা দেখে ফেলেছেন তাই সত্য কথা বলতে হল।

—অনেকে বলছে এসব ছবি তোলার কথা বাজে, আসলে সিনেমার লোকেরা এসেছে ক্যাপ্টেন ওয়ান-ইয়ারের হারানো সম্পদের খোঁজে। তোমাদের কাছে না-কি নতুন ধরনের মানচিত্র আর যন্ত্রপাতি আছে। বললেন মিসেস বার্টন।

—সত্যি সমুদ্র-গর্ভে যদি সোনা-দানা থাকত তাহলে লোকে অনেক আগেই খুঁজে বার করতো। নতুন মানচিত্র পাওয়া গেলে তাও নিয়ে আসতো। সিনেমার লোকদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরা সব খুঁজে বার করতো। কিন্তু মিসেস বার্টন সত্যি কথা বলছি আপনাকে, আমরা ধনরত্ন সম্পর্কে কিছু জানি না। আমরা ছবি তুলতেই এসেছি। লোককে আপনি তাই বলবেন।

—আচ্ছা বলব—কিন্তু ওরা কি আর আমার কথা শুনবে!

মিসেস বার্টন আবার ঘরের কাজে মন দিলেন।

জুপিটার মাসিক পত্রের পাতা উলটাতে লাগল।

এক সময় জুপি বলে—আমি কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, জবাব দেবেন, মিসেস বার্টন?

—হ্যাঁ। বল কি জানতে চাও।

কঙ্কাল-দ্বীপে ভৌতিক ব্যাপার কেমনভাবে শুরু হল?

মিসেস বার্টন বললেন—ঘোড়া-দোলনায় স্যালি ফ্যারিঙ্গটনের পেত্নীকে দেখা গেল রাতে। অনেক জেলে দেখল। শেষে লোকজন প্রমোদ-উপবনে যাওয়া বন্ধ করল। কঙ্কাল-দ্বীপে আর লোকজন যায় না, পেত্নীও চোখে পড়ে না। তারপর আবার পেত্নীর আবির্ভাব ঘটেছে। বছরে বেশ কয়েকবার তাকে দেখা যাচ্ছে।

—আচ্ছা কতদিন আগে পেত্নী প্রথম দেখা গিয়েছিল?

—দশ বছর আগে। তবে পনেরও হতে পারে। মাঝে পেত্নীকে আর দেখা যেত না। তারপর তোমরা সিনেমার লোকেরা এলে আর অমনি পেত্নীর আবির্ভাব ঘটতে শুরু হয়েছে। লোকে

বলছে যে, তোমাদের জিনিসপত্র চুরি হচ্ছে। মনে হয় একটা রহস্যজনক কিছু ঘটছে।

জুপিটার মাথা নাড়ল।

তার সন্ধ্যানী মনও সায় দিচ্ছে—হাঁ একটা রহস্য আছে।

নয়

চমৎকার সাগর-বাতাস বইছে।

ছোট পাল-তোলা নৌকোখানা হাওয়ায় ভর করে ছুটে চলছে যেন।

উপসাগরের বুকে আর কোন নৌকো নজরে পড়ছে না।

দিনের আলোয় দেখতে পাচ্ছে দ্বীপটা প্রস্তরময়। একটিও গাছ-গাছড়া নেই কোথাও। লোকজন থাকে না।

বব সেই ফোয়ারাটা দেখবার জন্যে তাকিয়েছিল।

—ফোয়ারাটা কই? চোখে পড়ছে না ত?

ক্রিস বলল—দ্বীপের নীচে এক ধরনের গর্ত আছে। ঢেউয়ের জল ওখানে দিয়ে সজোরে ঢোকে, ফোয়ারার মতন উপর দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। ঠিক যেন তিমি মাছ। আজ সমুদ্র ঠাণ্ডা। ঢেউ নেই তাই ফোয়ারাও নেই।

দ্বীপের মাঝামাঝি নৌকো আনল ক্রিস। এখান থেকে তীরভূমিও শ' খানেক গজ দূরে। পাল

ওরা আটকে পড়েছে। চিৎকার থামিয়ে নিরব হয়ে রয়েছে।

ওরা জেফ মর্টনের কাছ থেকে স্কুবা ডাইভিঙের জন্য পোশাক এবং যন্ত্রপাতি চেয়ে এনেছে। ফেস্-মাস্ক, পায়ের পাতা ঢাকার ফ্লিপার আর জলের নীচে জ্বালাবার জন্যে ছুটো ফ্লাশলাইট্ এনেছে।

রোদে পিঠ দিয়ে ওরা বসে আছে খুশি মনে।

নৌকো হাত-দ্বীপের দিকে চলেছে। দ্বীপটা সিকি মাইল লম্বা আর কয়েক শ' গজ চওড়া।

নামিয়ে নোঙর ফেলল ক্রিস।

বলল—ভাঁটা পড়েছে। জলের নীচে রয়েছে অজস্র ডুবো পাথর। জোয়ারের সময় নৌকো নিয়ে তীরে যাওয়া যায়। এখন যাওয়া যায় না।

নৌকো নোঙর বাঁধা অবস্থায় দুলতে লাগল।

ক্রিস একটা পুরোনো ফেস্-মাস্ক পরে নিল। বব আর পেটি পরল স্কুবা ডাইভিঙের পোষাক। ক্রিস

সাঁতরে গিয়ে একখানা পাথরে উঠে দাঁড়াল। ওদের ডাকল—এখানে এস!

ওরা সাঁতরে এসে ডুবো পাথরটার উপর দাঁড়ালো। —দেখ উপসাগরের এই জায়গাটায় আমি দুখানা ডাবলুন পেয়েছিলাম আর একখানা পেয়েছিলাম কাল তোমরা যেখানটায় পেয়েছিলে সেখানটায়। আমাদের ভাগ্য ভাল হলে আজও আমরা এখানে ডাবলুন পাব। বলল ক্রিস্।

বব বলল—গ্যাস নষ্ট করে কি দরকার। আমরা ক্রিসের মতন শুধু ফেস মাস্ক পরে ডুব দি চল। ওরা তীরে উঠল।

বব আর পেটি দুজনে স্কুবা-ডাইভিঙের যন্ত্রপাতি খুলে রাখল।

তিনজনে আবার সাগরে নামল শুধু ফেস-মাস্ক পরে। তীরের ধারে কাছে সব জায়গাটা ওরা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। বালি হাতড়ে হাতড়ে দেখল। না একখানাও ডাবলুন ওরা পেল না।

ওরা তীরে উঠে এল।

ক্রিস বলল—আজ দেখি ভাগ্য মন্দ! ভেবেছিলাম একখানাও পাব। বাবার অসুখ বেড়েছে, ওষুধ চাই। ঠিক আছে, আরও একটা জায়গা জানি ওখানটায় চল যাই।

একখানা মোটর-বোটের গর্জন শুনে ওরা সচকিত হল।

সবাই তাকাল মোটর-বোটের দিকে।

তীর ঘেঁষে মোটর-বোটখানা ছুটে আসছে। গতি কমাচ্ছে না। একি! এখানে জলের নীচে ডুবো পাহাড়। ওভাবে ছুটে এলে ত পাথরে ধাক্কা লাগবে!

ওরা লাফিয়ে উঠে দু'হাত তুলে চেঁচাতে লাগল। —হেই, সরিয়ে নাও। সরিয়ে নাও মোটর-বোট! এখানে পাথর আছে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! মোটর বোটের গতি একটুও কমাল না।

—লোকটা আমাদের এখানে দেখে ঠিক সোনা খুঁজতে আসছে। বলল ক্রিস।

মোটর-বোটের চালককে ওরা দেখতে পেল। একটা পুরানো টুপি ওর মাথায়। টুপিটা বিশ্রীভাবে কপালের ওপর টেনে দিয়েছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। সহসা চালক গতির রাশ টানল। মোটর-বোটখানা সজোরে একটা চক্কর দেওয়ার সময় ক্রিসের নৌকোর মাঝ বরাবর ঢুঁ মারল। ভারি মোটর বোটের ধাক্কায় নৌকোখানা কার্ড-বোর্ডের তৈরী নৌকোর মতন ভেঙ্গে গেল। সামান্য ক্ষণের জন্য মোটর-বোটের মুখ নৌকোর মধ্যে ঢুকে গেল। লোকটা সবেগে এঞ্জিন চালিয়ে মোটর বোটখানা ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে আরও দূরে চলে গেল। ওরা চিৎকার থামিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। হতাশা ভরা মন।

[✱ ✱ পরের সংখ্যায় সম্পূর্ণ পাবে]

শুকতারা পূজা সংখ্যায় থাকবে
কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পূর্ণ উপন্যাস

উপন্যাস

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

॥ ৪ ॥

কেষ্টদা চিৎকার করে গাছের ডাল চাপা পড়ে ছটফট করতে লাগল সেখানে। তপাই অনেক চেষ্টা করল কেষ্টদাকে বাঁচাবার। কিন্তু পারল না। ঐ শক্ত মোটা ডালটাকে কিছুতেই নড়াতে পারল না সে। অগত্যা গ্রামে ফিরে তপাই লোকজন নিয়ে উদ্ধার করল, কেষ্টদা তখন মৃত।

সে রাতে প্রচণ্ড জ্বর এলো তপাইয়ের। ডাক্তার এসে ওষুধ দিল। সেদিনই ওখানকার স্কুলের হেডমাস্টার মশাই পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে তপাইকে দেখে। ওর সঙ্গে কথা বলে ভারি পছন্দ হয় ছেলেটিকে। পিসেমশাই তপাইকে নিয়ে ওর দুঃখের কথা সব বলল।

হেডমাস্টার একটা গল্প শুনিয়েছিল। হেডমাস্টার অত্যন্ত সহজ ভাবে বলল তপাই খুব ভাল ছেলে। ভাল হয়ে নিক ও আমার কাছে থেকে মানুষ হবে।

পিসেমশাই যেন কিসে প্রাণে একটু বল পেলেন। তবে কি সত্যই তপাই ভাল হয়ে বড় হয়ে মানুষ হবে। নিশ্চিন্ত মনে দায়মুক্ত হলেন পিসেমশাই।

তপাইও মনে কি রকম একটা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়ে হেডমাস্টার মশাইয়ের কথা শুনেই চলতে লাগলো। তপাই নিজেই ভাবলো ও যেমন সাহস নিয়ে লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ঠিক ঐ ভাবে যদি পড়ায় মন দেয় তবে কেমন হয়। সত্যি সত্যিই তপাই পড়াশুনায় মন দিল। দেখতে দেখতে সময় কেটে মাস পেরিয়ে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তপাইয়ের নাম ছড়িয়ে পড়ল স্কুল থেকে গ্রামে গঞ্জে। পরীক্ষায় এখন তপাই ফার্স্ট হয়। তপাইয়ের মামাও কিন্তু এ খবর পেয়ে একটু আশ্চর্য হয়েছিল। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হবার পর আর কোন দ্বিধা রইলো না। সত্যিকারের একটা সুস্থ চিন্তাধারা নিয়ে তপাই যে পথে এগিয়ে চলেছে তা দেখে সবাই বিমুগ্ধ।

তপাইকে দেখতে মামা এলো। সেদিন তপাই মামাকে প্রণাম করে বলেছিল—হেসেই বলেছিল —এখন আর কিছুই করিনা মামা। মামার চোখে সুখের জল এসে গিয়ে জড়িয়ে ধরে আনন্দ করে বলেছিল মানুষের মতন মানুষ হয়ে পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রেখে দিতে পারবি না। পারবি রে তপাই! পারবি। পুজোর সময় বেড়াতে এলে তপাইয়ের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হতে বলেছিল—আগে যেভুল করেছি সেটার জন্য অনুতাপ হয় রে। মানুষের প্রথম পরিচয় হল চরিত্র। চরিত্র গঠনের দৃঢ় সঙ্কল্পকে মেনে নিয়ে তোরা যে পথেই অগ্রসর হোস না কেন তোদের জয় হবেই।

তাই আজ আমি যে পথ অনুসরণ করেছি সেটা ন্যায়ের পথ। আমায় দেখে আমার ছোটরা তারাও বড় হবে। তাদের ভবিষ্যৎ তৈরী হবে। হ্যাঁ, তোরা বলবি তোদের পরিবেশ?

সেটা অবশ্যই ঠিক কথা। কিন্তু আমরা যদি স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধীর জীবনী দেখি এবং সেই সব মহাপুরুষদের বাণী পড়ে নিজেরা ন্যায়ের পথে অগ্রসর হই, দেখবি নিজেরা তো ঠিক আছিই এবং অপরদেরও ভাল করতে পারবো।

সবার মধ্যে সেবা, শুশ্রূষা, গুরুজনদের ভক্তি প্রিয়জন আত্মীয়দের মধ্যে হৃদ্যতা সব মিলিয়ে হয় একটি চরিত্র। তোরা বলবি তপাই জ্ঞান দিচ্ছে! কিন্তু তা নয় রে। সত্যিকার মানুষ হল তার চরিত্র। মানব জগতে মানুষের প্রকৃত পরিচয় হল চরিত্র।

বন্ধুদের সবাইকে আপনজন ভেবেই তপাই সেদিন ঐসব কথা বলেছিল।

তপাই আরো বড় হয়েছে। কলেজে তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে। তপাইকে নিয়ে আর কারো দুশ্চিন্তা নেই।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা তপাই দিদির পাশে বসে আছে। তপাই দিদিকে বলছে জান, আমি না—পিসে-মশাইয়ের বাড়িতে হেডমাস্টার মশাই যখন আমায় একটা গল্প বলেছিল তার পরই আমি মনে মনে সূর্যসাক্ষী রেখে তোমার নাম করে প্রতিজ্ঞা করে ছিলাম! আমি ভাল হব।

আজ জানি না কতটা ভাল হতে পেরেছি!

* * পূজা সংখ্যায় পাবে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষুদেদের নিয়ে নকুড় মামার আজব কাণ্ডের উপন্যাস।

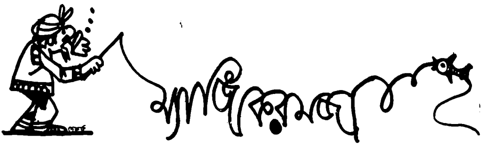

নির্মল চন্দ্র ব্যানার্জী

একটা ড্রইং কাগজ নাও তাতে তোমার মুখের ছবি আঁক। কাগজটা সাদা, তাতে একটা তুলি দিয়ে হাল্কা কোবল্ট ব্লু রং নিয়ে মাথার চুলে দিলে আর একটা তুলি নাও তাতে কেবল মুখটায় রং দাও। সবটাতেই একই রং ব্যবহার করছো কিন্তু! এখন দেখ ছবিটাকে বুনসেন বার্ণায়ের উপর রেখে সামন্থে একটু গরম করলেই মুখের রংটা হবে সবুজ আর চুলটা হবে ঘন বেগুনে রংএর।

এই মজার ছবি আঁকার জন্য যা দরকার—

জলে গোলা কয়েক টুকরো হাইড্রেটেড কোবালাটস ক্লোরাইড প্রথম তুলির জন্য কয়েক টুকরো হাইড্রেটেড অ্যাসিটেড। এটিও জলে গুলে নিতে হবে।

এই নীলাভ সবুজ মুখ আর বেগুনে চুলওলা ছবিটার উপর যদি অল্প জল স্প্রে করে দাও তবে ছবিটা আবার তার প্রথম অবস্থার রং ফিরে পাবে। অর্থাৎ হাল্কা বেগুনী রং এর হয়ে যাবে। তুমি নিজে করে দেখ আরও একটা মজার ছবি তৈরি করতে পার। সাদা ড্রইং কাগজে একটা জেব্রার ছবি এঁকে নাও। জেব্রার গায়ে ডোরা কাটা দাগগুল বসাও। এবার একটা তুলি ঘন অ্যান্টিমনি ক্লোরাইড দ্রবণে ডুবিয়ে জেব্রার গায়ের ভিতরে ডোরা কাটা একটা দাগে বেশ ভাল করে বুলাও। অন্য ডোরা কাটা দাগগুলোতে আর একটা তুলি নিয়ে ঘন লেড অ্যাসিটেট দ্রবণ বুলাও। এবার কিপস যন্ত্র থেকে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বের করে তার সামনে ঐ কাগজটা ধর: জেব্রার ডোরা কাটা ঘরগুলো পর পর কমলা ও কালো রং এর হয়ে যাবে। সাবধান, হাইড্রোজেন সালফাইড বিষাক্ত গ্যাস। যেন এই গ্যাস তোমার নাকের মধ্যে না যায়।

★ কেন এমন হয়?

হাইড্রোজেন সালফাইডের সাথে দ্রবণগুলির বিক্রিয়ায় অ্যান্টিমণিন সালফাইড (কমলা রং এর) এবং লেড সালফাইড (কালো রংয়ের) উৎপন্ন হয়।

মটু মতলব এঁটে কেল্টুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো! বরফ ফ্যাক্টরিতে মটু কেল্টু দুজনেই ঢুকে পড়লো। থরে থরে সাজানো বরফে উঠতে গিয়ে—

শেষ পর্যন্ত মার খেতে খেতে কেল্টু ও মটু দুজনের অবস্থা শোচনীয়। হিম ঘর দেখে ঐ রাস্তায় পালাবার মতলব এঁটে ছুটতে লাগলো।

বাঃ এখানে তো দেখছি বেশ চারিদিকে বরফের ঢাল, উঁচু থেকে নিচে সব রকমের প্র্যাক্‌টিস করা যেতে পারে। তবে যেন কি একটা 'ক্লাব' এর জন্য এসব ব্যবস্থা। চল্ কেল্টু দেখা যাক।

না রে কেল্টু, এদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারলে—আমরা পাহাড়ের পথে যেতে পারবো। ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি। ক্লাব ঘরে ঘাপটি মেরে মটু আর কেল্টু সব লক্ষ্য রাখতে লাগলো।

মটু চোখে ভুল দেখছে।   ওর বাবার কথা মনে পড়ে।   চল কেল্টু ওদের পিছু নেওয়া যাক।
ঐ পথে ওরা এগোচ্ছে—কেল্টুর হাতে একটা ফ্ল্যাগ নিয়ে চলেছে।

মটুর সঙ্গে ওদের দলের ক্যাপ্টেনের আলাপ হয়ে যেতে ওদের সঙ্গে পিছনে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছে—কিন্তু কি ঠাণ্ডা পড়েছে। বরফ পড়ছে। ক্যাম্পটা একটু একটু কাঁপছেরে কেল্টু।

একটা ক্যাম্পে তখনো আগুন জ্বালিয়ে গান বাজনা করছিল। মটু শুনবে বলে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখছে। সকাল হলেই শেষ ক্যাম্প থেকে রওনা দেবে এই ঠিক হয়ে আছে। হঠাৎই মটুর পায়ে একটা বরফ চাঁই এসে গড়লো! ব্যাস্। .... !

উ-উ-উ
আরে-বাবা-রে...!
কি করে যাব! কালু আমায় তোর ব্যাগে পুরে দে!
কি হে! পথ দেখাবে তো?
চল এসে গেছি মটু! তোমার কেল্টুই প্রথম পাহাড় চুড়ায় পতাকা রেখেছে।
মটু আমরা এসে গেছি! ছবি তুলবো!
মটু ছবি তুলছি
রেডি - ছবি উঠছে! মটুর মুখটা ব্যাগ থেকে বার করে দাও।
OK. কেল্টু, ঠিক আছে।

অলৌকিক একটি মানুষ ও আমরা

অজয় দাশগুপ্ত

শেষ পর্যন্ত পাঁচজনে যাওয়া ঠিক হল। আমি, বিমল, পাঁচু, পিন্টু ও আমাদের অভিভাবক হয়ে আশুদাদু। এতটা আমি আশা করি নি।

একে আমি শহুরে ছেলে তার ওপর হাঁটা পথে এতটা রাস্তা।

আশুদাদু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি পারবে তো রতন?'

'হু' ঘাড় কাত করে জবাব দিয়েছিলেম। এমন একটা অ্যাডভেঞ্চার-এর লোভ কি ছাড়া যায়! 'খুব পারব।'

'অনেকটা রাস্তা কিন্তু'—আশুদাদু তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি।

'রোজ তো স্কুলে যাই।'

'তা যাও'—আশুদাদু মাথা দুলিয়ে বলেছিলেন, 'এখান থেকে স্কুল যতটা, স্কুল থেকে তারও বেশী রাস্তা।'

'আশুদাদু' রতন পারবে।' পাঁচু বলে উঠেছিল। সে বয়সে আমাদের মধ্যে বড়। তার কথায় আশুদাদু আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তিনি মত দিয়ে দিলেন।

পরদিন সকাল থেকেই যাওয়ার আয়োজন শুরু হল। আয়োজন মানে আর কিছু না। তোড়জোড় করা। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সবাই খেয়ে নিলাম, যদিও আমরা খাওয়ার নেমতন্ন রক্ষা করতেই যাচ্ছিলাম। আমাদের গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে উনশিয়া গ্রাম। সেখানেই আমাদের যেতে হবে। স্কুল পুরোহিতের বাড়ি বাসন্তী পুজো। সেই উপলক্ষ্যে দুপুরে প্রসাদ পাবার নেমতন্ন।

উনশিয়া ছিল তখনকার পূর্ব বাংলার এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের বাস। উনশিয়া অর্থাৎ উন মানে নেই, শিয়া মানে মুসলমান। এই গ্রামের খ্যাতি ছিল প্রচণ্ড। এখানকার ব্রাহ্মণরা

ছিলেন খুবই প্রভাবশালী।

সাত মাইল রাস্তা। ঠিক ছিল দশটায় বেরিয়ে পড়ব। দু ঘণ্টায়, বড় জোর আড়াই ঘণ্টায় 'পৌঁছে যাব। আবার ওখান থেকে তিনটেয় রওনা হলে পাঁচটা বা সাড়ে পাঁচটায় যতই দেরী হোক সন্ধ্যের আগে বাড়ি চলে আসব। চৈত্র মাস, সুতরাং সন্ধ্যে দেরীতেই হবে। রাস্তাটা আশুদাদুই চিনতেন। পাঁচু খানিকটা আন্দাজে জানে। আমরা তিনজনে কিছুই জানি না। সুতরাং আশুদাদুই ভরসা। আশুদাদু ছিলেন আবার রাতকানা। তাই যাওয়া আর ফিরে আসা দিনে দিনেই ঠিক হয়েছিল।

দশটায় রওনা দেওয়া হল না। এদিক ওদিক করতে করতেই দেরী হয়ে গেল। এগারোটায় গ্রাম থেকে পাঁচজন বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামের পেছন দিয়ে বিরাট ক্ষেতের রাস্তা। এবড়ো খেবড়ো আলপথ। মাত্র তিন মাস এই ক্ষেত শুকনো থাকে। বাকি সময় এখানে দু'মানুষের মতো জল।

খটখটে শুকনো মাঠ। ধান কাটা হয়ে গেছে। এখন ধানগাছের শুকনো গোড়া রোদে পুড়ছে। পা বাচিয়ে আলপথ ধরে চলেছি। রোদে গা পুড়ছে। আশুদাদু ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছিলেন। বুড়ো মানুষ, রোদ থেকে মাথা বাঁচিয়ে চলেছেন। ওই মাঠটা শেষ হল। এরপর বেশ উঁচুতে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা। এই রাস্তা ধরে মাইল খানেক যেতেই স্কুলের সামনে এসে পড়লাম। স্কুলের পেছন দিয়ে আবার একটা বিরাট ক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়লাম।

ক্ষেতটা যে কত বড় তা বোঝা গেল না। ধূ ধূ করছে ধানকাটা জমি। চারপাশে যতদুর চোখ যায় কোনো গ্রাম বা বসতির চিহ্ন নেই।

আলরাস্তা বাতলাতে বাতলাতে আশুদাদু বললেন, 'জানিস রতন আমাদের এ অঞ্চলে এটা সবচেয়ে বড় বিল।'

বিল অর্থাৎ বর্ষাকালে জলের তলায় তলিয়ে যায়। পূর্ব বাংলায় বেশির ভাগ ধান ক্ষেতই এমন বিল জমিতে। এখানে ধানের ফলনই বাংলাদেশকে সুজলা সুফলা করেছিল।

হাঁটছি তো হাঁটছিই। ক্ষেত আর ফুরোয় না। বেলা অনেক হয়েছে। সূর্য কখন মাথার ওপরে চলে এসেছে। বসন্তকাল হলেও বাতাসে আগুনের হলকা। যতবার 'আর কতদূর' বলি, আশুদাদুর ঠোঁটে মুচকি হাসি জেগে ওঠে। তিনি শুধু বলেন 'ওই দূরে চণ্ডীমঙ্গলের জঙ্গল, জঙ্গলটা পেরুলেই উনশিয়া গ্রাম।'

আশুদাদুর আঙুলের নির্দেশ মতো এক খোকা সবুজ রঙ দেখা যায়। ঘন সবুজ এক পোঁচ যেন আকাশের গায়ে মাখানো। ক্রমশ গতি কমে আসে। দুপুরের রোদের তেজ সবাইকেই ক্লান্ত করে তোলে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বাদে আমরা সেই সবুজের কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি।

বিশাল জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সুঁড়িপথ। সূর্যের আলো এখানে প্রায় নেই বললেই চলে। নিস্তব্ধ ছায়ার চাদর মাড়িয়ে আমরা এগোতে থাকি। আশুদাদু বহুক্ষণ ছাতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। জঙ্গলের মাঝামাঝি জড়াজড়ি করে দুটো বট অশ্বত্থ গাছ। গাছের গুড়ির চারপাশে গোল করে শান বাঁধানো। দু-চারটে বড় বড় নুড়ি রয়েছে সিঁদুর মাখানো। আশুদাদু বললেন, 'এটাই চণ্ডীমঙ্গলের স্থান, ভীষণ জাগ্রত।'

দিনের বেলাতেই গা ছমছম করে ওঠে। কেমন একটা অস্বাভাবিক চাপা ভাব। আমরা তাড়াতাড়ি

পা চালাই। দেখতে দেখতে এক সময় জঙ্গল ফুরোয় ভয়টা কমে। জঙ্গলের ওপারেই গ্রামের শুরু।

'আমরা এসে গেছি' আশুদাদু বলেন।

শুনে সবাই খুশি হয়ে উঠি। যাক এবার একটু বসতে পাব। সামান্য সময়েই আমরা কুলপুরোহিতের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে এসে দাঁড়াই। দূর থেকেই ঢাক আর কাঁসির বাজনা শুনেছিলাম। এবার মা দশভুজার মূর্তি দেখতে পেলাম। ধূপের ধোঁয়ায় প্রদীপের আলোয় একটা পবিত্র অনুভব চারপাশে ছড়ানো। কুলপুরোহিত নিজে পূজো করছিলেন। আমরা সকলে মণ্ডপের সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। মণ্ডপের সামনে আটচালায় সাদা চাদর বেছানো। সেখানে আমাদের বসতে দেওয়া হল।

বসতে পেয়ে সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। চারদিক তাকাতেই মণ্ডপের একপাশে একটা দেওয়াল ঘড়িতে চোখ পড়ল। কাঁটায় কাঁটায় দেড়টা বাজে। তার মানে সাত মাইল পথ হাঁটতে তিন ঘণ্টা লেগেছে।

ফিসফিস করে দাদুকে বললাম, বেশ বেলা হয়েছে, তাড়াতাড়ি না করলে কিন্তু ঝামেলায় পড়ব।'

আমাদের বসিয়ে দাদু কোথায় গেলেন। একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, 'সন্ধি পুজোর একটু দেরী হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে এলাম। আর বেশি সময় লাগবে না। তোরা একটু ধৈর্য ধরে বস।'

পরিশ্রমে প্রচণ্ড ক্ষিদেও পেয়েছিল। মেঠো রাস্তা হাঁটতে বাড়ির ভাত বহুক্ষণ হজম হয়ে গেছে। কখন খাওয়ার ডাক পড়বে আশায় আশায় আছি আর বার বার ঘড়ি দেখছি। আড়াইটে বেজে গেল। তবু কোনো সাড়া নেই। এবার আমরা চঞ্চল হলাম। এরপর খেয়ে কখন রওনা দেব। আশুদাদাকে তাগাদা লাগালাম। তিনিও কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। তবু আবার গেলেন।

এভাবে বার তিনেক তাগাদার পর যখন ব্যবস্থা হল তখন ঘড়িতে তিনটে বেজে গেছে। খাওয়ার চিন্তা ছেড়ে কতক্ষণে রওনা দেব এই কথাটাই আমাদের মাথায় ভর করল। এতটা রাস্তা। দিনের আলো থাকতে না ফিরতে পারলে খুব বিপদে পড়ব। সূর্যের আলো মরে গেলেই আশুদাদু প্রায় অন্ধ। তখন পথ দেখা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। অন্তত স্কুল পর্যন্ত যেতে পারলে তবে রক্ষে।

খেয়ে উঠতে চারটে বেজে গেল। রোদের তেজ কমে এসেছে। বিকেলের ঢল নেমেছে বাড়ির চালে আর গাছের মাথায়। বিদায় সম্ভাষণ প্রণাম করে সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা ফেরবার পথে পা বাড়ালাম!

চণ্ডীমঙ্গলের জঙ্গলে ঢুকে মনে হল এখানে এখুনি রাত নামবে। গা ছমছমে অন্ধকার। সুঁড়িপথ প্রায় দৃষ্টি সীমার বাইরে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আশুদাদু তবু ভরসা দিলেন, এখানে 'সূর্য ঢুকতে পায় না তাই, বাইরে এখনো রোদ আছে, তাড়াতাড়ি পা চালা।'

তাড়াতাড়ি চলব মনে করলেই চলা যায় না। একে ভরাপেটে হাঁটছি তার ওপর সারাদিনের ক্লান্তি। তাছাড়া দাদু নিজেই পথ চলতে পারছিলেন না। পিন্টু তাঁর হাত ধরে নিয়েছে। পাঁচু আগে আগে যাচ্ছে তারপর আমরা। সেই চণ্ডীতলায় এসে ভয়টা বাড়ল। ঘুটঘুটি অন্ধকার। কোথাও কোনো লোকজন নেই। আমাদের পা

যেন অজানা ভয়ে থেমে পড়তে লাগল।

'ভয় পেলে চলবে না তাড়াতাড়ি আয়' পাঁচু বলে উঠল। 'জঙ্গলটা থেকে বেরতে আর পথ খুঁজে পাব না।'

'ঠিক বলেছিস—'বিমল ওর কথায় সায় দিল। আমরা কোনো কথা বললাম না। প্রাণপণে ভগবানের নাম নিয়ে অন্ধকার ঠেলে চলতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত এক সময় জঙ্গল পেরিয়ে সেই সীমাহীন শূন্য ধান ক্ষেতের কিনারায় এসে দাঁড়ালাম। আমাদের কাছে ঘড়ি ছিল না। তবু সূর্যের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম দিন শেষ হয়ে আসছে।

আলপথে আশুদাদু আবার দৃষ্টি ফিরে পেলেন। তিনি পাঁচুকে কিভাবে যেতে হবে চলতে চলতে তার কিছু নির্দেশ দিয়ে দিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন বড়জোর আর আধঘন্টা তিনি দেখতে পাবেন।

আঁকাবাঁকা আলপথে মাঠ ভাঙছি। সূর্য এবার হারিয়ে গেল দিগন্তে। ওই বিরাট ক্ষেতের কতটা যে এসেছি তা বুঝতে পারছি না। আকাশের উপুড় করা কালো রঙে মাঠ ঢেকে গেল। আশুদাদু বলে উঠলেন, আমি আর দেখতে পাচ্ছি না।

'ঠিক আছে,' পাঁচু বলে উঠল, 'মনে হয় অদ্ধেকটা এসে গেছি। বাকিটুকু চলে যাব।'

অন্ধকার ক্ষেত। সরু আলপথ। সাবধানে আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। সময় কাটানোর জন্য গল্প করছিলাম। ভয়ের গল্প। আমরা ভয় পাচ্ছিলাম অথচ এ সময়ে ঠিক ভূতের গল্পই আমাদের মাথায় ভর করছিল। আশুদাদুর থলেতে অসংখ্য গল্প। শুনতে শুনতে সকলের গা শিউরে উঠছে।

'কিরে পাঁচু, আর কত হাঁটব?' বিমল বলে উঠল। 'বহুক্ষণ হয়ে গেল তোর ক্ষেত তো শেষ হচ্ছে না।' 'পাঁচু, ঠিক পথে যাচ্ছিস তো' আশুদাদুর এবার সন্দেহ হল।

'তাইতো! পাঁচু একটু থমকে দাঁড়াল। সকলেই কালিমাখা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সবাই চারদিকে তাকালাম। কোথায় কি। কোনো দিকে গ্রামের চিহ্ন নেই। অনুমান করে দেখলাম অন্ধকার হওয়ার পর বহু সময় হেঁটেছি।

দাদু বুঝতে পারছি না কোন দিকে যাচ্ছি। সামনে গ্রাম থাকলে তো আলো টালো দেখা যেত।

এবার দিশাহারা অবস্থা। একবার এদিক একবার ওদিক যাচ্ছি। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। হাতে ঘড়ি নেই। সময়ও বুঝতে পারছি না। শরীরের ভেতর কেমন একটা কাঁপুনি দিচ্ছিল। পায়ের নিচে মাটি যেন সরে যাচ্ছে।

'পাঁচু, ওই দেখ, ওই দূরে—'হঠাৎ বিমল চেঁচিয়ে উঠল। ওর নির্দেশ মতো দিকে আমরা সবাই তাকালাম।

সবাই অবাক হয়ে দেখলাম বহুদূরে এক জায়গায় আলো জ্বলছে। আর চিন্তা করার সময় নেই। 'ওই তো আলো নিশ্চয় ওই দিকে গ্রাম আছে। চল চল।' পাঁচু নির্দেশ দিল।

আলো লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলাম। অনেকটা পথ যাওয়ার পর ভোজবাজির মতো আলো নিবে গেল। ভারী আশ্চর্য! কি হল বোঝবার আগেই ক্ষেতের অন্যদিকে আবার আলো জ্বলে উঠল। দাদুকে সব বলা হল। দাদু বুঝতে পারলেন। তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। গলার আওয়াজেই বোঝা গেল থমথমে। তিনি বললেন, 'পাঁচু ওই আলো দেখে ছোটাছুটি করো না। এর মধ্যেই

আমরা ভুল করেছি। আলেয়ার আলোর মায়ায় জড়িয়ে গেছি।'

আলেয়ার আলো কথায় শুনেছি। জীবনে দেখি নি। এই চাক্ষুষ হল। চার পাশে তাকালাম। দূরে অন্ধকারে আরেক জায়গায় ওই আলো জ্বলে উঠল। ফ্যাল ফ্যাল করে ওই আলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'এখন কি করব আশুদাদু?' পাঁচু হতাশ হয়ে বলে উঠল।

'কি আর করবি?' দাদুর গলাতেও হতাশা। 'এই বিশাল ক্ষেতজমিতে রাস্তা হাতড়ে বেড়ানো খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতোন। এইখানেই একটু জিরিয়ে নে। একটু বাদে আকাশে চাঁদ উঠবে। সেই আলোই একমাত্র ভরসা। তাছাড়া কিছু করার নেই।'

সব কজনই আলের ওপর বসে পড়লাম। বসে বসে নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শোনা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। তা প্রায় আরো ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করতে হল। এক সময় চাঁদ উঠল। নবমীর চাঁদ। খুব আলো না হলেও মোটামুটি জগৎটা দৃশ্যমান হল। আমাদের চারপাশের ক্ষেতজমি মায়াবী আলোয় ফুটে উঠল।

'দাদু এবার চলুন যাওয়া যাক।' পাঁচু গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'মনে হয় এখন রাত অনেক।'

সবাই উঠে পড়লাম। আশুদাদুও উঠলেন। তিনি একবার চারপাশ তাকালেন। তারপর একদিকে হাত তুলে রাস্তার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'পুরোপুরি ঠাহর করতে পারছি না পাঁচু, তবু মনে হয় এখন আমাদের ওই দিকেই যেতে হবে। চল দেখি। জানি না ভাগ্যে কি আছে।'

কথা বন্ধ করে সবাই আবার হাঁটা শুরু করলাম। উঁচু নীচু আলপথে হোঁচট খেয়ে বেশ খানিক হাঁটবার পর দেখতে গেলাম দাদুর অনুমান ঠিক। সামান্য দূরেই ডিস্টিক্ট বোর্ডের উঁচু রাস্তা। বিমল চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদু, ওই তো সদর রাস্তা, উঃ এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।'

সেই রাস্তায় উঠে পাঁচটি মানুষের ধড়ে প্রাণ এল। মনে হল এখন যত রাতই হোক, ভয় নেই। সদর রাস্তা ধরে এবার গ্রামের ভেতর দিয়ে স্কুল পর্যন্ত চলে এলাম। শরীর জুড়ে ক্লান্তি। চোখে ঘুম। জল পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু আমাদের হাঁটার বিরাম নেই।

স্কুল ছাড়িয়ে আবার ক্ষেতজমিতে নামতে হবে। কোনাকুনি এই মাঠ ভাঙতে পারলেই বাড়ি পৌঁছব। এবার আর দাদুর ভরসা করতে হবে না। আমরা সবাই এ রাস্তা চিনি। রাস্তা থেকে মেঠো জমিতে নামবার মুখে দুপাশে মাটি উঁচু ঢিপির মতো হয়ে আছে। প্রায় দোতলা সমান উঁচু হবে। সেই ঢিপির মধ্যে দিয়ে পথ। এখানে দু পাশে কোনো গ্রাম বা বাড়ি নেই।

পাঁচু সামনে। তার পেছনে আমি আর বিমল। একদম শেষে পিন্টু আশুদাদুর হাত ধরে। জ্যোৎস্নাটা এখন চোখে সয়ে গেছে। সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। সরু পথে পাঁচু নেমে পড়েছে। পেছনে আমরা। হঠাৎ পাঁচু থেমে পড়ল। তারপরই সে চেঁচিয়ে উঠল অস্বাভাবিক ভাবে। তার গলায় ভয়ের প্রকাশ ফুটে উঠল। সে বলল,' 'রতন, বিমল ওই দ্যাখ।'

অবাক কাণ্ড! ওর চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সামনে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে আমাদের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

একপাশের ঢিপির ওপর থেকে একজন নিরাবরণ মানুষ ঠিক টিকটিকির মতো খাড়াই দেওয়াল বেয়ে নেমে এল। আমাদের চোখের সামনেই তরতর করে অন্যদিকের দেওয়াল বেয়ে ঢিপির মাথায় উঠে গেল।

ব্যস ! তারপরই অদৃশ্য। লোকটা যে কয়েক মুহূর্তে কোথায় মিলিয়ে গেল কে জানে। স্তব্ধ নির্বাক হয়ে আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যেন আমাদের প্রাণের গতিকে থামিয়ে দিয়েছে।

আশুদাদু বললেন, 'তোদের চোখের ভুল—ভুল দেখেছিস।'

'আমি স্পষ্ট দেখেছি।' পাঁচু বলল। 'লোকটা সাধারণ মানুষের চেয়ে লম্বা।'

'আমরাও ঠিক দেখেছি লোকটাকে।' বিমল বলল, 'কি তাড়াতাড়ি যে উঠে গেল।'

পিন্টু বলল সেও দেখেছে। তবে নামবার সময় চোখে পড়েনি। ওঠবার সময় আমাদের মতোই দেখেছে।

এবার আমরা দৌড় লাগালাম। প্রাণভয়ে পালানো বলা চলে। মাঝে মাঝেই পেছনে তাকিয়ে দেখছি কেউ আমাদের তাড়া করছে কিনা। সময় জ্ঞান সবই হারিয়ে আমরা ছুটেছিলাম। নিজেদের ফিরে পেলাম বাড়ি থেকে কিছু দূরে কয়েকটা হ্যারিকেনের আলো আর মানুষ দেখে।

আমাদের বাড়ির অন্যরা এত রাত হয়েছে আমরা ফিরছি না দেখে টর্চ হ্যারিকেন নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। যাক ওদের আর তেমন খুঁজতে হয় নি। আমাদের দেখতে পেয়ে সবাই নিশ্চিন্ত হল। বাড়ি ফিরে জানতে পারলাম তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। সোনাদাদু খানিকটা বকাবকি করলেন। সমস্ত শুনে তিনি অবশ্য চুপ করে গেলেন। পথ হারিয়েছি, আলেয়ার আলোর কবলে পড়েছি এগুলো সবাই মেনে নিল। শুধু অন্তরীক্ষ থেকে নেমে আসা মানুষটার কথা কেউই বিশ্বাস করল না। চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দিল। বাধ্য হয়ে আমরা চারজন চুপ করে গেলাম। ও নিয়ে আর তর্ক করি নি।

কিন্তু আজও দীর্ঘকাল বাদে আমি মনে মনে সেই সিদ্ধান্ত মানতে পারি নি। ভাবলেই স্পষ্ট মানুষটার চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চাঁদের আলোয় উলঙ্গ একটা মানুষ কোথা থেকে আবির্ভূত হল আর কেমন করেই বা ওই ভাবে হেঁটে কোথায় অদৃশ্য হল আজও তার উত্তর খুঁজে পাই নি।

হয়তো গোটা জীবনে এর উত্তর খুঁজে পাব না। তা বলে তাকে কোনোদিন অস্বীকার করতেও পারব না। কত অলৌকিক ঘটনা তো প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনে ঘটে চলেছে। এও হয়তো তেমনি কিছু অলৌকিক কিংবা আধাভৌতিক।

শীতের রাতে ট্রেনে

মানবেন্দ্র পাল

সেবার পুজো পড়েছিল একেবারে আশ্বিনের শেষে। ঠিক পুজোর মুখে হাওড়া থেকে সন্ধ্যের ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলাম। দিনকাল খারাপ, সঙ্গে কিছু টাকা পয়সাও আছে। ভেবে ছিলাম বেলাবেলি ট্রেন ধরব। কিন্তু সে আর হয়ে উঠলনা।

গাড়িতে বেশ ভিড়। কোথাও বসার জায়গা পাচ্ছি না। হঠাৎ একটা কামরা একদম খালি দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্যাপার আর কিছুই না বগিটা আগে ফার্স্ট ক্লাস ছিল, চওড়া বেঞ্চ, হাতল লাগানো। সামনে করিডোর। সেটা যে এখন ক্লাস টু হয়ে গেছে সেটা কেউ লক্ষ্য করছে না। আমি তখনই সেই খালি গাড়িতে উঠলাম।

উঠলাম তো কিন্তু গাড়ির অবস্থা দেখে চক্ষু চড়কগাছ। চওড়া বেঞ্চি—কিন্তু গদি আর স্প্রিং কে বা কারা তুলে নিয়ে গেছে। শুধু পেরেকগুলো উঁচু হয়ে আছে। বাঙ্কগুলোর গদি উধাও। লোহার ফ্রেমটা শুধু কংকালের মত মাথার ওপর পড়ে আছে।

কি আর করি উঠেছি যখন তখন আর নামব না। নেমেই বা যাব কোথায়? কোনো রকমে কাগজ পেতে ফার্স্ট ক্লাসে বসলাম।

গাড়ি ছাড়ল একটু পরে। আর সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কার করলাম শুধু গদি স্প্রিং বা ফ্যান নয়, আলোর বালব্‌গুলিও খুলে নেওয়া হয়েছে।

কি আর করা যাবে অন্ধকার গাড়িতে চোখ বুজিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এক সময়ে গাড়ি কখন ব্যাণ্ডেল পার হয়ে গেছে খেয়াল নেই। গাড়ি ত্রিবেণীর দিকে ছুটছে। আমার কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল বড্ড একলা। এর মধ্যে গাড়িতে আর কোনো প্যাসেঞ্জার উঠেছে কিনা খুব আশা নিয়ে দেখতে উঠলাম। করিডোর দিয়ে চলেছি—আশ্চর্য গোটা বগিতে একমাত্র আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। আমার গা ছমছম্ করতে লাগল। এ কি করে সম্ভব হল? গোটা ট্রেনে লোক ভর্তি আর এই বগিটাতেই কেউ উঠল না।

সবাই কি এটাকে ফার্স্ট ক্লাস বলে ভুল করল ?
হঠাৎ ল্যাভাটেরির দরজায় শব্দ হল। তারপর দেখি তার ভেতর থেকে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ একজন বেরিয়ে আসছে। আমার কি মনে হল—তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় চুপ করে বসলাম। দেখি লোকটা দুবার করিডোর দিয়ে যাতায়াত করল তারপর আমার খুপরিতেই এসে ঢুকলো।
অন্ধকারে মনে হল লোকটা যেন অলক্ষণ আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর আমার পাশে এসে বসল। আশ্চর্য ! এতক্ষণ অন্ধকার কামরায় একলা ছিলাম বলে ভয় করছিল, আর এখন আমারই পাশে একজনকে বসতে দেখে কেমন আতঙ্ক হচ্ছে।
কিসের আতঙ্ক ?
ঠিক জানি না। তার অস্তিত্বটাই আমার কাছে আতঙ্কের। সে যদি সীটে বসে নড়ত-চড়ত, যদি গা এলিয়ে বসত, যদি আমার সঙ্গে দু-একটা কথা বলত তাহলেও নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু সে এসে পর্যন্ত দরজার দিকে মুখ করে আছে আমাকে মুখ দেখাবে না। কিম্বা ভাবছে কখন উঠে চলে যাবে। সে বোধ হয় বসার জন্যে আসে নি। তাহলে কি জন্যে অন্ধকারে আমার পাশে এসে বসল ? সেও তবে আমার মতোই সঙ্গী খুঁজছিল ? কিন্তু দেখে তো তা মনে হয় না।
আচ্ছা লোকটা অমন করে আপাদ মস্তক সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে আছে কেন ? এখনো তো কার্তিক মাস পড়েনি। এত শীত ?
লোকটা কি তবে অসুস্থ ?
অসুস্থ মানুষ কি অমন সোজা হয়ে বসে থাকতে পারে ?
ট্রেন ছুটছে। শহর আর নেই। এখন ছোটো ছোটো স্টেশন। দুপাশে জঙ্গল। অন্ধকার, আমি ভয়ে জানলার দিকে মুখ করে বসে আছি। আমার মনে পড়ছে খালি-কামরায় এই রকম অস্বাভাবিক আবির্ভাব নিয়ে অনেক ঘটনা শুনেছি। এটাও কি সেইরকম কিছু ?
আচ্ছা, লোকটা বাথরুমে ঢুকল কখন ? ব্যাণ্ডেলে ? দেখতে পাইনি তো ?
অন্ধকার বলে ?
কেউ কি গাড়িতে উঠেই বাথরুমে যায় ?
তা ছাড়া বেছে বেছে কি কেউ অন্ধকার কামরাতেই ওঠে ?
তাহলে ?
তাহলে যে কী তা ভাবতেও আমি শিউরে উঠলাম। হঠাৎ একটা চাপা স্বর কানে এল।
—আপনার রুমালটা দেবেন ?
রুমাল !
এতক্ষণ যা ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম তা যদি সত্যি হয় তাহলে কথা বলল কি করে ?
ওরা কি মানুষের মতো কথা বলতে পারে ?
যাই হোক তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমামটা বের করে কোনো রকমে ফেলে দিলাম।
সে রুমালটা নিয়ে হেঁট হয়ে কি করতে লাগল। খুব কৌতূহল। পকেটে টর্চও ছিল। কিন্তু জ্বালতে সাহস হল না।
কিছুক্ষণ পরে গাড়িটা হঠাৎ মাঝ পথে দাঁড়িয়ে গেল।
কি হল ? চেন টানল কে ?
তারপরেই সামনের দিকের একটা গাড়ি থেকে চিৎকার আর্তনাদ শোনা গেল। আমি চমকে উঠলাম। কি হল !
তারপরেই দেখি কামরাটা থেকে প্যাসেঞ্জাররা হুড়-

মুড় করে নেমে পড়ছে। তারা ছোটাছুটি করছে।

—ডাকাত——ডাকাত—

দুম্ দাম্ করে বোম ফাটল। চিৎকার কান্না—

রেল রক্ষীরা ছুটল রাইফেল হাতে।

কাঁপতে কাঁপতে আমিও স্যুটকেসটা আঁকড়ে ধরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। অনেক টাকা সঙ্গে রয়েছে। গাড়িতে একা থাকা ঠিক নয়।

শেষ পর্যন্ত নেমে পড়লাম। চারি দিকে ধূ ধূ মাঠ কোথাও এতটুকু আলো নেই। শুধু ভয়ার্ত প্যাসেঞ্জারদের টর্চের আলো মাঝে মাঝে চমকে উঠছে।

একবার ভাবলাম অন্য কোনো কামরায়—যে কামরায় লোক আছে আলো আছে—সেখানে চলে যাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল এসবে তো

ছিল সেখানে টর্চের আলো পড়তেই দেখলাম থকথকে রক্ত। আমার সর্বশরীর কেঁপে উঠল রক্ত কেন ?

ভূতের কি রক্ত থাকে ? না।

তাহলে ও তো মানুষ। হয় তো কোনো কারণে পা কেটে গিয়েছিল, রক্ত পড়েছে।

সেইজন্যেই কি রুমাল চাইল ?

কিন্তু আমায় তো কিছু বলল না। টর্চও তো চাইতে পারত ?

যাই হোক, এত রক্ত পড়েছে যার সে গেল কোথায় ? সেও কি আমার মতো ভয়ে পালিয়েছে ? আমার না হয় ভয়ের কারণ আছে। কিন্তু তার তো সঙ্গে কিছুই ছিল না। তাহলে ?

আমার আবার ভয় করতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি নেমে অন্য গাড়িতেই চলে গেলাম।

হাঙ্গামা হচ্ছে। তার চেয়ে আমার কামরাতেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকি। আর তিনটে তো মাত্র স্টেশন, তার পরেই বাড়ি পৌঁছে যাব।

আমি আবার উঠে এলাম। নিজের—খুপরিতে গিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু সে লোকটা গেল কোথায় ? আমি এবার স্যুটকেসটা হাতে নিয়েই উঠে টর্চ জ্বেলে কামরার সর্বত্র খুঁজলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম না। তাহলে ?

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল মেঝেতে। যেখানে লোকটা বসে-

ট্রেন ছাড়ল এক ঘণ্টা পরে। এক সঙ্গে তিন চারটে কামরায় হানা দেওয়া হয়েছিল। মাঝ পথে চেন টেনে ডাকাতরা পালায়। কেউ ধরা পড়েনি। তবে লাইনের ওপরে পুলিশ নাকি রক্তের ফোঁটা দেখেছে নিশ্চয় কোন ডাকাত চোট খেয়েছে। কুকুর আনানো হচ্ছে। বৃষ্টি না হলে ডাকাতরা ধরা পড়তোই প্যাসেঞ্জাররা ভবিষ্যদ্বাণী করছে।

কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।

তাহলে এতক্ষণ আমার পাশে যে বসেছিল সেও—কিন্তু সে আমার ক্ষতি করল না কেন ?

আচমকা এক ঝাঁক শিয়ালের হুক্কাহুয়া ডাক শুনে চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভয়ার্ত চোখে চারিদিক ঘুরে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মাথার উপর কুমড়োর ফালির মত পঞ্চমীর এক খণ্ড বাঁকা চাঁদ। আসে পাশের ঝোপঝাড়ের দিকে নজর পড়তেই গা-ছমছম করে উঠল। ওরা যেন সব ভুতের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। তলে চাপ স্পষ্ট ভেসে উঠলো মানুষের মত লম্বা লম্বা হাত-পা। ভূত পেতনীর ভয় আমার কোনদিনই ছিল না। মনের ভুল ভেবে চোখের পাতাদুটি ভাল করে রগড়িয়ে নিলাম। ফিরে গাছটার দিকে চোখ তুলে তাকালাম। এমন সময় গা ছমছম নিঝুম রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে কে যেন ভয়ংকর একটা বিকট হাসি হেসে উঠল। ভয়ে চমকে

নিশির ডাক

মনোজকান্তি ঘোষ

চাপ অন্ধকার। ভাবছি কোথায় এলাম। এই ভুতুড়ে বন থেকে বেরিয়ে যেতে মনটা আঁকু-পাঁকু করতে লাগল।

সামনে একটা কদম গাছের দিকে নজর পড়তেই ভয়ে শিউরে উঠলাম। আলোর ফুলকির মত বিন্দু বিন্দু ওগুলো কি জ্বলছে। স্থির দৃষ্টি মেলে গাছের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে চোখের সামনে উঠলাম। সাহসের ঠাট আর বজায় রাখতে পারলাম না। শক্ত কাঠ হয়ে গেলাম। পা দু'টি বশ হারিয়ে অবশ হয়ে গেল। বেঁহুশ হয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। আমার সারা গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল।

ঠিক তখনই এক ঝলক ঝির ঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগল। বাতাসের সাথে নাকে ভেসে

এলো কদম ফুলের মিষ্টি গন্ধ। ভারী শরীরটা হালকা হল। মনটা আবার তাজা হয়ে উঠল। সামনের সেই রহস্যময় গাছের দিকে আবার চোখ তুলে তাকালাম। ভুতুড়ে গাছটা এখন যেন নিসাড় হয়ে ভূতের মত অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে।

হঠাৎ পিছন দিকে শুকনো পাতার মচ মচ শব্দ শুনে আবার চমকে উঠলাম। চকিতে সেই দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। দুরু দুরু বুকে আবছা চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম আমারই বয়সী একটা ছোট্ট ছেলে গুটি গুটি পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার সারা গা ভিজে জবজব করছে। চুল থেকে টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে। মনে হচ্ছে ছেলেটি সদ্য স্নান করে এলো। একটু অবাক হলাম। আগুনের ভাটার মত জ্বলন্ত চোখের চাহনি নিয়ে সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। তার গা থেকে ছড়িয়ে পড়ল কদমফুলের মিষ্টি গন্ধ। ছেলেটির জ্বলন্ত চোখে চোখ রেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। আবছা অন্ধকারে তার মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। ফ্যাস ফ্যাসে গলায় নেকী সুরে ছেলেটি বলল, কি গো ভাই ভোম্বল, আমাকে চিনতে পারছো? তারপর সে আরও একটু আমার কাছে এগিয়ে এসে আবার বলল, তুমি দরদর করে ঘামছিলে দেখে আমার খুব মায়া হল তাই তো আমি ঠাণ্ডা বাতাস পাঠিয়ে তোমাকে শীতল করলাম। কদম ফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে তোমার ভীতু মনটাকে সতেজ করে দিলাম। এখন চলতো ভাই তোমার সাথে বসে দুটো অতীত দিনের সুখ দুঃখের গল্প করি।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, তুমি কে ভাই? এত রাতে এই ভুতুড়ে বনে নাইতে এসেছ?

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি খিক্ খিক্ করে হেসে উঠে নেকী সুরে বলল, আমি বুম্বা, আমাকে চিনতে পারছ না? ভ্রূ কুঁচকে অবিশ্বাসের চোখে ওর ভিজে মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললাম, বুম্বা! সে তো অনেক দিন আগেই জলেডুবে মারা গেছে!

ছেলেটি জ্বলন্ত চোখের চাহনি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমিই সেই বুম্বা। এই তোমার মনে আছে। হাজার হলেও আমরা তো বন্ধু ছিলাম। তারপর বুম্বা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তোমার মনে পড়ে ভোম্বল, আমি যখন বেঁচে ছিলাম তখন এই সব ভূত প্রেত কিছুই বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখ, এখন মরে গিয়ে নিজেই ভূত হয়ে বেঁচে আছি। তবে হ্যাঁ, প্রেত লোকে আমার খুব দাপট। মনুষ্যলোকে যা কোনদিন পাইনি এখানে তা পেয়েছি। এ অঞ্চলের সব ভূত পেতনী আমাকে সম্মান করে খুব। ভূত সমাজে আমার কত নামডাক। ওরা সভা করে আমার নাম দিয়েছে প্রেতরাজ অর্থাৎ প্রেত জগতের রাজা।

বুম্বার কথা শুনে ভয়ে জড়ভরত হয়ে গেলাম। সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। তার কথায় আমি যে ভয় পাচ্ছি বুম্বা হয়তো সেটা আঁচ করতে পেরেছিল। তাই আমাকে অভয় দিয়ে বলল, তোর কোন ভয় নেই রে ভোম্বল। তুই তো ভীতু নস্। আমাদের যারা ভয় পায় আমরা শুধু তাদেরই ভয় দেখাই। এই তো সেদিন গিয়েছিলাম গাঁয়ে একটু ঘুরতে। হঠাৎ একটা পুঁচকে ছোড়া আমাকে দেখেই হাউ মাউ করে অজ্ঞান হয়ে গেল। এ সব দেখলে কার না রাগ হয়, বল? ভীতুর ডিম ছানাগুলোর জন্যে প্রাণ খুলে যে একটু ঘুরবো তারও কোন উপায় নেই। রেগে মেগে দিলাম বাছাধনের ঘাড়টা ধরে মট মট করে মটকে। আর

যায় কোথায়। মুহূর্তে তার সাধের পরাণ পাখি বুকের খাঁচা থেকে ফুড়ুৎ করে উড়ে এই কদম-গাছেই জুড়ে বসল। এখন সে নিজেই ভূত। কেনরে বাবা, তুই মানুষ, মানুষের মত থাক। আমি ভূত, ভূতের মত থাকি। তানা দেখা মাত্র হাউ মাউ খাঁউ। আরে বাবা, আমরা চোর না ডাকাত যে আমাদের দেখা মাত্র হৈ চৈ করে বাড়ি মাথায় তুলতে হবে। কথাগুলো বলতে বলতে বুম্বা রাগে গর গর করতে লাগল। তার নাক-মুখের ফোকর থেকে শ্বাস প্রশ্বাস ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে আসতে লাগল। চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল। আমি ওর রকম-সকম দেখে ভয়ে জবুথবু হয়ে গেলাম। আমার হাবভাব দেখে মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে একগাল হেসে বলল, থাক ওসব বাজে কথা। অনেক দিন পরে তোকে কাছে পেয়েছি। চল বসি তোর সাথে দুটো সুখ দুঃখের গল্প করি। বলেই বুম্বা তার হিম শীতল

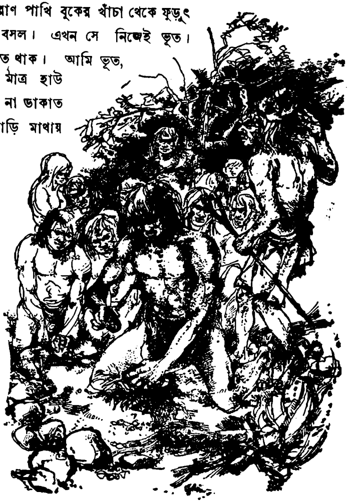

হাত দিয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরলো। আমার সারা গা ঠাণ্ডায় শির শির করে উঠল। বুকে সাহস নিয়ে যন্ত্রচালিত মেশিনের মত আমি প্রেতরাজের পাশপাশি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। সেই ভূতুড়ে কদমগাছের তলায় এসে বুম্বা আমাকে গাছে উঠতে বলল। গাছের গোড়ায় একটা মই ছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে সুবোধ ছেলের মত সেই মই বেয়ে গাছে উঠে পড়লাম। বুম্বা ছায়ার মত বাতাসে ভর করে গাছে উঠে এলো। একটা মোটা ডাল দেখিয়ে আমাকে বসতে বলল।

আমি বসতেই বুম্বা আমার পাশে বসে পড়ল। তারপর গাছটার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, দেখছো আমাদের সংসার।

ছানাবড়া চোখে তাকিয়ে দেখি গাছে অনেক ভূত পেতনী কিলবিল করছে। তারা সব ডালে ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পেতনীদের চুল খোলা। বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছে। ঝাড়ুর মত চুলগুলো পিছন দিকে লম্বা হয়ে আছে। ভূত পেতনীদের চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠ। তারা সব ঘাড় উঁচু করে মগডালের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দিকে

নজর পড়তেই দেখি দুটো মিশ মিশে কালো ভূত নিঃশব্দে মারামারি করছে। একে অন্যকে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করছে। ছানাবড়া চোখে বুম্বার মুখের দিকে তাকালাম। বুম্বা আমার চাহনির অর্থ বুঝতে পেরে বলল, ওটা জায়গা দখলের লড়াই চলছে। ওই ডালটার দাবী দু'জনের কেউ ছাড়তে চাইছে না। তাই ওরা মারামারি করছে।

অবাক হয়ে বললাম সব ভূত পেতনী ওদের মারামারি দেখছে অথচ কেউ এগিয়ে গিয়ে থামিয়ে দিচ্ছে না কেন ?

বুম্বা বলল ভূতেরা বড় শান্তি প্রিয় ও নিরীহ। অকারণে ঝুট ঝামেলায় জড়াতে চায় না। তারপর ওই ভূতটা আনকোরা নতুন এসেছে। কারুর সাথেই এখনও ওদের পরিচয় হয়নি। তুমি একটু একা বস, আমি আসছি। বলেই বুম্বা বাতাসে ভেসে ওদের ডালে চলে গেল। দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, আপনারা মারামারি বন্ধ করুন। নতুন এসেছেন। ভূতেদের রীতিনীতি কিছুই আপনাদের জানা নেই। এভাবে জ্যান্ত মানুষদের মত যদি জায়গা দখলের মারামারি করেন তাহলে আপনাদের দু'জনকেই এই গাছ থেকে নামিয়ে দেব।

ওরা বুম্বার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত স্বরে বলল, কেন, কেন ? নামিয়ে দেবেন কেন ?

বুম্বা বক্তৃতা দেবার ঢং এ বলল, আজকাল মানুষদের যেভাবে অপঘাতে মৃত্যু হচ্ছে তাতে ভূতেদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু বসবাসের জায়গা কমছে। মানুষেরা বন বাদাড় কেটে সাফ করে দিচ্ছে। আমরা ভয় দেখিয়েও তাদের থামাতে পারছিনা। এ ভাবে চললে ভবিষ্যতে ভূতেদের বসবাসের উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। তাই বলি বন্ধুগণ, আপনারা আত্মকলহ করবেন না। ধৈর্য ধরুন আমি আপনাদের এই গাছেই বসবাসের জায়গা করে দিচ্ছি! আর একটা কথা আপনারা যে ডালটার জন্যে মারামারি করছেন, সেই ডালের যিনি বাসিন্দা তিনি দেশে গিয়েছেন ভয় দেখাতে। যাতে তার কু-পুত্রেরা অতি সু-পুত্রের মত গয়ায় পিণ্ডি দান করে ওনাকে প্রেতলোক থেকে উদ্ধার করে। উনি ফিরে এলে আপনারা আবার নিরাশ্রয় হবেন। তাই প্রথম থেকেই নিজেদের জায়গা বেছেনিন। দেখুন ওই যে মগডালে দুটো কচি ডাল বেরিয়েছে ওই ডাল দুটো দখল করে আপনারা স্থায়ী বসবাসের আস্তানা গড়ুন।

নূতন ভূত দুটো নরম সুরে বলল, ওতো কচি ডাল তার উপর খুব ছোট্ট ওতে থাকতে আমাদের খুব কষ্ট হবে।

বুম্বা বলল, সে কথা মানি কিন্তু এখন কোন উপায় নেই। ছোট্ট শরীরে কিছু কাল বসবাস করুন দেখুন আপনাদের প্রিয়জনেরা পিণ্ড দান করে, প্রেতলোক থেকে আপনাদের উদ্ধার করে কিনা। যদি না করে তবে ওই ডালটাতেই আপনারা চিরস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। ইতোমধ্যে ডালটাও বড় হয়ে উঠবে। তখন আপনারা আরামে থাকতে পারবেন। গাছের বড় ডাল একটাও খালি নেই। আর আজকের এই বড় ডালগুলি একদিন আপনাদের দেওয়া ডালদুটির মত কচি ও ছোট ছিল।

উপায়ান্তর নেই দেখে নতুন ভূত দুটো বুম্বার দেওয়া বিধান মেনে নিল। সব ভূত পেতনীর মধ্যে আবার একটা স্বস্তির ভাব লক্ষ করলাম। বুম্বা লম্বা পা ফেলে আবার আমার কাছে ফিরে এলো। নূতন

ভূত ছুটো সেই কচি ডালে গিয়ে ছোট্ট শরীরে পা ঝুলিয়ে বসল।

বুম্বা একে একে সকলের সাথে আমার পরিচয় করে দিল। ভূতের মাসি, পিসী, কাকু, জেঠু সকলের সাথেই পরিচয় হল। বুম্বার ভূত দাদু দারুণ আমুদে ভূত। তিনি আমাকে নিয়ে খুব মজা করতে লাগলেন আমি আস্তে আস্তে সব জড়তা কাটিয়ে ওদের সাথে বসে হাসি গল্পে মশগুল হয়ে রইলাম।

হঠাৎ একটা পেতনী আমার পাশে উড়ে এসে নেকী সুরে বলল, কিরে ভোম্বল আমাকে চিনতে পারিস ? ও, তুই এ রূপে আমাকে চিনবি না। দাঁড়া ভোল পালটাই। বলেই সেই ভয়ঙ্কর পেতনীর রূপ পালটিয়ে এক লাবণ্যময়ী রমণীর রূপ নিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে চিৎকার করে বললাম, হ্যাঁ, তোমাকে আমি চিনি। তুমি চারু মাসি। সেই যে অমাবস্যার মধ্য রাতে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিলে।

চারুমাসি মুহূর্তে পেতনীর রূপ নিয়ে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, সেই তো আমার কাল হল। অপমৃত্যু—বলেই হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। তার দু'চোখের কোকর থেকে ঝুপ ঝুপ করে জল পড়তে লাগল। আমি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম চারুমাসির বিদঘুটে মুখের দিকে। তারপর চারু মাসি আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, এখন সারা জীবন আমাকে ভূত হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। মুক্তির কোন উপায় নাই।

চারুমাসির কান্না দেখে আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। তাই চুপচাপ শক্ত হয়ে বসে রইলাম। চারুমাসি আরও কিছুটা আমার কাছে এগিয়ে এসে বসল তারপর, তার হিম শীতল হাড়ের হাত দিয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরে মিনতির সুরে বলল, আমার তো ছেলে নেই। তুই আমার হয়ে গয়ায় গিয়ে, একটা পিণ্ডি দিবি ভোম্বল ?

আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, তুমি কিচ্ছু ভেবনা মাসি। দেখ, আমি ঠিক গয়ায় গিয়ে প্রেতশিলায় তোমার নামে একটা পিণ্ডিদান করে তোমাকে এই প্রেতলোক থেকে উদ্ধার করে স্বর্গলোকে পাঠিয়ে দেব।

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতে ভূত পেতনী ছিল তারা সব হুড়মুড় করে আমার দিকে ছুটে আসতে লাগল। কে কাকে পিছনে ফেলে আগে আসতে পারে তার জন্যই শুরু হয়ে গেল ঠেলাঠেলির প্রতিযোগিতা। শেষ পর্যন্ত ওদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি লেগে গেল। কয়েকটা ভূত পেতনী গাছের ডাল থেকে ঝুপ ঝুপ করে নীচে ছিটকে পড়ল। তারা আবার বাতাসে ভর করে ডালে উঠে এসে এলোপাথারী ঘুসি চালাতে লাগল। সুযোগ পেয়ে একটা বাচ্চা ভূত ওদের পায়ের ফাঁক দিয়ে ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে এসে আমার কোলের উপর ঝুপ করে বসে পড়ল। তারপর সে করুণ মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আধ আধ সুরে বলল, গয়ায় গেলে আমার নামে একটা পিণ্ডি দেবেন তো, মানুষ কাকু ?

আমি ভূতদের এই সব কাণ্ড কারখানা দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। বুম্বা তড়াক করে এক লাফ দিয়ে উপরের ডালে উঠে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে বলতে লাগল, আপনারা শান্ত হউন। জায়গা মত গিয়ে বসুন। তারপর এক এক করে এগিয়ে এসে আপনাদের নাম ঠিকানা এবং মৃত্যুর কারণ বলে যান। ভোম্বল আমার

বন্ধু আমি কথা দিচ্ছি ও প্রত্যেকের নামে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আসবে। তাতে কাজ হল। ওরা শান্ত হয়ে যে যার জায়গায় গিয়ে বসল। বাচ্চা ভূতটা কিন্তু নট নড়ন চড়ন। সে দিব্য আরামে আমার কোলের উপর বসে তার হাতের বুড়ো আঙ্গুল পরম তৃপ্তিতে চুক্ চুক্ শব্দ করে চুষতে লাগল। বুম্বা তাকে আমার কোলে দেখে ভীষণ রেগে গেল। কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে তুলে দু'গালে দুই ষণ্ডা মার্কা চড় বসিয়ে দিল। সে কাঁদতে কাঁদতে নিজের জায়গায় গিয়ে চুপচাপ বসে পড়ল।

বুম্বার কথা মত ওরা কচু পাতায় উপর মাছের কাঁটা দিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নাম ঠিকানা এবং

মৃত্যুর কারণ লিখে আমার কাছে জমা দিয়ে গেল। আমি ওদের কথা দিলাম, প্রত্যেকের নামে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দেব। ওরা খুশি মনে যে যার জায়গায় গিয়ে শান্ত হয়ে বসল।

কচুর পাতাগুলো হাতে নিয়ে সামনের দিকে নজর পড়তেই ভয়ে চমকে উঠলাম। বুকের মধ্যে ধপাস্ ধপাস্ করে কাঁপতে শুরু করে দিল। ওরে বাপ্পুরে সামনে ওটা আবার কি জন্তু। কুলোর মত কান। মুলোর মত দাঁত। হাড়ির মত শরীর আর তার চোখদুটো যেন দুটো জ্বলন্ত উনুন। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। গাবদা গাবদা পা ফেলে সে হেলে দুলে এগিয়ে আসছে। চারিদিকে ভীষণ আঁসটে-গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি তাকে দেখে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম। চোখ দুটি বন্ধ করে পরিত্রাহি রাম রাম জপ করতে লাগলাম। মুহূর্তে সারা গাছে ঝড় বয়ে গেল। বুম্বা তড়াক করে এক লাফ দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। গাছের সব ভূত পেতনী ছুটোছুটি শুরু করে দিল। একটা শুকনো ডাল মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ল। সামনে দিয়ে যে উৎকট জন্তুটা গুটি গুটি এগিয়ে আসছিল, সে উলটো দিক ফিরে চোঁচা দৌড় লাগাল।

রাম নাম বন্ধ করতেই দেখি সব ভূত পেতনী এক এক করে ফিরে এসে আমাকে গোল করে ঘিরে ধরল। তারা সব ভূতের ভাষায় নেকী সুরে চিঁচি করে কি যেন সব বলাবলি করতে লাগল। ওদের হাবভাব দেখে মনে হল ওরা সব রাগে গজ-গজ করছে। আমার উপর ভীষণ রেগে গিয়ে কোন শলা পরামর্শ করছে। সব ভূত পেতনীদের একটা ডালে দাঁড় করিয়ে রেখে চারুমাসি আর বুম্বা আমায় দু'পাশে এসে বসল। দূরে দাড়িয়ে থাকা ভূত পেতনীদের চোখে চোখ পড়তেই ওরা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে লাগল। ভয়ে আমি জবুথবু হয়ে গেলাম। চোখ নামিয়ে দুরু দুরু বুকে চারুমাসির পাংশুটে মুখের দিকে

তাকালাম। তখনই মাসি আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ঝিমধরা গলায় কাচুমাচু হয়ে বলল, ছিঃ ভোম্বল, ওই 'আম আম' নামটা আর উচ্চারণ কোরনা। ওই বাজে নামটা শুনলে আমাদের খুব কষ্ট হয়।

আমি বললাম তোমাদের দেখে ওই নামটা বলিনি চারুমাসি। ওই যে বিকট জন্তুটা এগিয়ে আসছিল- আমি তাকে দেখেই ভয়ে ওই নামটা বলে ফেলে-ছিলাম।

আমার কথা শুনে চারুমাসির মুখটা হাসিতে ঝলমল করে উঠল। সব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভূত পেতনী গুলো খুশিতে নাচতে নাচতে যে যার ডালে গিয়ে বসল। চারুমাসি খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, বলল ওতো কিপটে ভূতের শ্বশুর। মেছোভূত। নীচু জাতি। ও গাছে উঠতে পারে না ? ওর গা দিয়ে আঁসটে গন্ধ বের হয়। আমরা ওকে ছুঁই না।

আমি অবাক হয়ে চারুমাসির মুখের দিকে তাকিয়ে-বল কি মাসি, তোমাদের মধ্যেও উঁচু নীচু জাতি আছে নাকি ?

চারুমাসি ফ্যাস ফ্যাসে গলায় বলল, আমরাও তো মানুষ ছিলামরে পাগলা। শোন, উঁচু জাতের মানুষ মরলে গেছোভূত হয়। অর্থাৎ গাছে থাকে। যত উঁচু জাতের মানুষ হবে তত গাছের উঁচু ডালে থাকবে। আর নীচু জাতের মানুষ মরলে মেছো-ভূত, মেঠোভূত, শ্মশান ভূত হয়। ওরা গাছে উঠতে পারে না। ওই যে মগ ডালে যে ভূত গুলো দেখছিস ওরা সব ব্রাহ্মণ ভূত। আমরা একটু নীচের ডালে বাস করি আমরা কায়স্থ ভূত। আর বদ্যি ভূতেরা গাব গাছে থাকে !

এমনিতে আমি জাত টাত মানি না। তাই ওসব শুনতে আমার ভালও লাগছিল না। তার উপর ভীষণ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। খিদের পেট চোঁচোঁ করছিল। চারুমাসিকে থামিয়ে বললাম, চারুমাসি আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। পেটে ব্যথা করছে। আমাকে কিছু খেতে দেবে ?

চারুমাসি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল। আমি তোর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি তোর খিদে পেয়েছে। তুই এক কাজ কর, বুম্বার পিঠে পিঠ লাগিয়ে একটুখানি বস দেখিনি। চারুমাসির কথামত বুম্বার পিঠে পিঠ লাগিয়ে বসতেই দেখি মণ্ডা মিঠাই ভরা ভরা মস্ত একটা ধামা। চারুমাসি নেকী সুরে বলল, খা দেখিনি মণ্ডা মিঠাই পেটটি পুরে বাছা।

অত মণ্ডামিঠাই এক সাথে দেখে আমি আর লোভ সামলাতে পারলাম না ; রাক্ষসের মত টপা টপ মুখে পুরতে লাগলাম। হঠাৎ গাছে আবার ঝড় শুরু হয়ে গেল। সব ভূত পেতনী এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। তারা সব ভোজ বাজির মত কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। গাছে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা। একা একা আমার খুব ভয় করতে লাগল। আমি চিৎকার করে ডেকে বললাম, চারুমাসিগো, তোমরা কোথায় গেলে ? কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে কেন ? আমার খুব ভয় করছে। কান্না পাচ্ছে।

দূর থেকে একটা নেকী সুরেব ক্ষীণ কণ্ঠ বাতাসে ভেসে এলো। শুনতে পেলাম চারুমাসি বলছে, আমরা এখন চলে যাচ্ছি। তাকিয়ে দেখ পুবের আকাশ রাঙা। সূর্যমামা আলোর টাঙা নিয়ে ছুটে আসছে। তাই আমরা অন্ধকারের দেশে চলে যাচ্ছি।

চারুমাসির কথা শুনে ধড়ফড় করে বিছানার উপর

[এর পরের অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়]

বাড়ির সামনে ঝাঁকড়া বেলগাছটার ডগায় পেল্লায় সাইজের ঘুড়িটা আজ চারদিন ধরে লটর-পটর করছে। পেটে-বুকে কালা কালা দাগ। খানিকটা সুতোও জড়িয়ে আছে শরীরে তবু যেন কিছুতেই ছিঁড়ে পড়ে না। কেন পড়ছে না?' বারকতক এ প্রশ্নটা করে বার পাঁচেক কানমলা খেয়েছে মুন্তু দিদিভাই টুপাইয়ের কাছে।

মুন্তুর দিদি অনেক বড় ক্লাসে উঠে বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে, ফালতু প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। বেশী ঘ্যান ঘ্যান করলে হয় কানমলা নয় চাঁটি কষিয়ে দেয় মধ্যে আছে ঝাঁকড়া বেলগাছ, রায়েদের বিরাট দীঘি আর লম্বা রেললাইন।

মুন্তুর এখন পড়ার চাপ বেড়েছে। তবু আকাশ দেখার ঝোঁক কমেনি। শুধুই কি আকাশ? সামনের রায়দীঘিতে ছোটন, পকাই, টিপুদের জল ছুঁড়ে খেলা দেখতে দেখতে মুন্তুর চোখেও জল এসে পড়ে। ভাবে, ওমন করে খেললে কি সত্যিই রোজ অসুখ করবে? তবে ওদের করে না কেন? এমন প্রশ্ন মাকেও প্রায় করে মুন্তু। কোনদিন জবাব পায় কোনদিন পায় না। যেদিন মায়ের চোখে-

একটুকরো আকাশ ও মুন্তু

সমীরণ মুখোপাধ্যায়

মুন্তুর মাথায়। সেদিন কানমলা খেয়ে ভ্যাঁক করে আর কাঁদেনি মুন্তু। সোজা হাত মুঠি করে দিদিভাইকে বলেছিল, আমায় মারলি যে বড়! তুই ছোট ছিলি না কোনদিন?

মুন্তুর কথায় একটু দমে গিয়ে ছিল টুপাই। পালটা আর কোন কথা বলেনি। পরে অবশ্য মুন্তু বাপীকে বলেছে দিদি ওকে মেরেছে এবং প্রায়ই মারে।

দোতলার জানলার ফাঁক দিয়ে মুন্তুর দেখার জিনিসের মুখে হাসি থাকে সেদিন মা শান্ত গলায় জবাব দেয়, ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে জল ঘাঁটতে ঘাঁটতে। তোমার তো অভ্যেস নেই। অসুখ তো করবেই মামণি।

এসব উত্তর মুন্তুর এখন আর ভাল লাগে না। অভ্যেস কি একদিনে হয় নাকি। বাপী বরং একটু আলাদা কথা বলে। তাই নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়াও কম হয় না। মা মুন্তুকে বলে, বাড়ির

বাইরে যেও না। উঠোনে খেলা কর। বাবা কিন্তু অন্য কথা বলে। বলে, বাড়ির বাইরে গিয়ে খেলা করতে পারো তবে বেশীক্ষণ নয়। দু-জনের কথায় একটুকুও ভরসা মেলে না মুস্তুর। তাই রাগ করেই মুস্তু ঠিক করেছে স্কুল থেকে ফিরেই সে দোতলার ঘরে বসে সবকিছু দেখবে। যতটুকু দেখা যায়। দিদিভাই লুডো, ক্যারাম খেলার কথা বলতে এলেও সে যাবে না। চুপচাপ বসে দেখবে হুস-হাস করে রেলগাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। ঝাঁকড়া বেলগাছটার পাশে বেঁটে খেজুর গাছের গায়ে বসেছে কাঠঠোকরা, একটু কান পাতলেই শোনা যায় ঠক্-ঠক্ ঠক্-ঠক্ শব্দ। দুপ্-দাপ করে রায়দীঘিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলে মেয়ের দল। একরাশ মজা আর ফূর্তি নিয়ে ওরা ডুব সাঁতার, চিৎ সাঁতার দেয়। আবার পাড়ে উঠে ঝুপ করে লাফ মারে। বেলগাছটার ডগায় কাটা ঘুড়িটা হাঁস-ফাঁস করে পালানোর জন্য।

মুস্তুর খুব ইচ্ছে করে খুব ইচ্ছে জাগে সোজা গাছের মাথায় উঠে কাটা ছেঁড়া ঘুড়িটাকে 'যা' বলে উড়িয়ে দিতে। পারে না। মুস্তুর মাঝে মাঝেই এখন চোখের কোলে চিক্‌চিক করে জল। ভাবে, এই দরজা, জানলা, ইট-কাঠের পাঁচিলগুলো হঠাৎ করে যদি হাট হয়ে যেত। তবে মুস্তু ঠিক পালাত। বেশীদূর না ঐ রায়দীঘির পাড় কিংবা ছোটন, পকাইদের আড্ডায়। কেউ বলার থাকত না। মুস্তুর ইচ্ছাকে কে আর প্রশ্রয় দেবে? নিজের মনেই প্রশ্ন করে মুস্তু।

———

[৫৮ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

উঠে বসলাম। ঘুম জড়ানো চোখে চিৎকার করে বললাম, চারুমাসি, তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। সেদিন ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু এরপর থেকে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। চারুমাসি আর বুম্বার জন্যে আমার অবচেতন মন গুমরে গুমরে কেঁদে উঠতো। আমি সব সময় ওদের কথা ভাবতাম। মন বলত চারুমাসি আর বুম্বাকে দূরে ওই বনে গেলেই খুঁজে পাব। প্রতিদিন গভীর রাতে ওরা ওখানে আসে। তাই নিশীথে ঘুমের ঘোরে কোন কোন দিন চলে যেতাম ওই ভূতুড়ে বনে। তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতাম চারুমাসি আর বুম্বাকে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ডাকতাম চা—রু—মা—সি—, বু—ম্বা—।

নিঝুম রাতকে খান খান করে ঘুমন্ত পৃথিবীর বুক চিরে সেই ভয়ংকর চিৎকারের ধ্বনি ভয়াল রূপ নিয়ে চলে যেত বন বাদাড় ঘুরে ঘুরে অনেক দূরে—সেই লোকালয়ে। গা ছমছম নিশুতি রাতে সেই ডাক শুনে কেঁপে উঠতো লোকালয়ের লোকেরা। যারা জানতো তারা বলতো ওকে ভূতে পেয়েছে। আর যারা জানতো না, তারা ভয়ে জবুথবু হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিস্ ফিস্ করে বলতো, নিশি ডাকছে।'

———

কবির কৌতুক

পথিক মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথ অনেক কৌতুক করতেন। তোমাদের তা আগে শুনিয়েছি। এবার শোন আরো মজার মজার কৌতুক কাহিনী যা তোমরা আগে বোধ হয় শোন নি।

রবীন্দ্রনাথের অনেক ভৃত্য ছিল। ভৃত্যদের সঙ্গেও তিনি রসিকতা করতে ছাড়েন নি। উমাচরণ নামে এক আমুদে ভৃত্যর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই হাস্য-পরিহাস করতেন। এই উমাচরণ খুব ভাল খাবার তৈরী ও রান্না করতে পারতো। প্রতিটি খাদ্যই হত সুস্বাদু। রবীন্দ্রনাথ এই উমাচরণকে প্রায়ই প্রশংসা করে বলতেন, তোর মা (কবির স্ত্রী) মারা যাবার সময় তাঁর ডান হাত খানা তোকে দিয়ে গেছে, না রে ?

এই উমাচরণ যেমন ছিল আমুদে তেমনি সাধু নামে অন্য একজন ভৃত্য ছিল প্রচণ্ড গম্ভীর প্রকৃতির। এমন গম্ভীর ভৃত্য রবীন্দ্রনাথ আগে কোন দিন দেখেন নি। একদিন ক্ষিতিমোহনবাবু রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাধু নামে ভৃত্যটি কেমন ?

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, আর বলেন কেন মশাই। ও কি আমার ভৃত্য ? যা গম্ভীর ! মনে হয় আমার গার্জেন। কথা তো শুনতে পাই না, শুনতে পাই গর্জন।

এবারে আরো মজার কথা শোন আরো একজন ভৃত্যের। এই চাকরটির নাম মহাদেব। এই ভৃত্যটি রবীন্দ্রনাথের খুব অনুগত। সে থাকতো কবির ঘরের ঠিক পাশের একটা ঘরে। আর গরম পড়লে সে বারান্দায় শুতো।

একদিন হল কি রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চাঁদের আলোয় তাঁর ঘরটা ভরে গেছে, চাঁদও সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে। চোখে এত আলো লাগলে কি কারুর ঘুম হয় ? রবীন্দ্রনাথ মহাদেবকে ডেকে বললেন, ওরে চাঁদটা ঢেকে দেতো। ঘুম হচ্ছে না।

মহাদেব ছিল ভারী বোকা। সে ভেবেই পেল না দূরে ঐ আকাশের চাঁদটাকে সে কি ক'রে ঢাকবে। সে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে লাগলো। রবীন্দ্রনাথ একটু মুচকি হেসে বললেন, আরে পারছিসনে ? এক কাজ কর, ঐ জানলাটা বন্ধ ক'রে দে তো।

মহাদেব জানলা বন্ধ করতেই চাঁদ ঢাকা পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, দেখলি-তো চাঁদ ঢাকা পড়লো। তোর মহাদেব নাম সত্যি সার্থক। মহাদেবের মতো বুদ্ধি রাখিস তুই। আমাদের দেশে এখন যেমন প্রায়ই সভাসমিতি ও আন্দোলন করতে দেখো, তখনও এর অবস্থা ছিল আরো সাংঘাতিক। তখন প্রতিটি ভারত-

বাসীর একই ধ্যান-জ্ঞান ছিল—দেশকে স্বাধীন করা। তখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও চুপ করে ঘরে বসে থাকেন নি। দেশব্যাপী নানান সভাসমিতিতে তিনি ভাষণ দিচ্ছেন। সব সময় ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর দিন কাটছে। ঠিক এই সময় নাটোরের মহারাজের কন্যার বিয়ে ঠিক হয়েছে। কন্যার বিয়ের দিন মহারাজা নিজে দাঁড়িয়ে অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করছেন। মহারাজা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে এসে হাজির হলেন। আসতে বেশ দেরি হয়ে গেছে তাঁর। নাটোরের মহারাজা কবিকে দেখে বলে উঠলেন, আজ আমার কন্যাদায়, কোথায় আপনি সকাল সকাল আসবেন, তানা, আপনি দেরিতে এলেন। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে বললেন, রাজন, আমারও মাতৃদায় দু'জায়গায় সভা করে আসতে হল।

আজ এই পর্যন্তই থাক। তোমদের কেমন লাগছে জানাও। আরো অজানা তথ্য জানাবো যা শুনে তোমরা আরো মজা পাবে।

———

ধাঁধা

গৌতম ঘোষ

ব্যাকরণের—

তোমরা জান নিশ্চয়ই যে বাংলা ভাষায় আমরা বিভিন্ন বাক্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করি সেইসব বাক্যের অর্থকে জোরদার করতে।

আচ্ছা নীচে 'ক' শ্রেণীতে সাতটি বাক্য রয়েছে। দেখতো 'খ' শ্রেণী থেকে উপযুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো নিয়ে বাক্যের মধ্যে ঠিক জায়গায় বসিয়ে অর্থগুলো আরো জোরালো করা যায় কিনা।

'ক'

(১) অন্যায় করেছে তো, ওইজন্য বকুনী খেয়ে ওরকম করছে।

(২) বাচ্চাটা কি সুন্দর দেখ, কেমন করে হাসছে।

(৩) সারারাত অন্ধকারে ইঁদুরগুলো শব্দ করে ঘুরে বেড়িয়েছে আর উৎপাত করেছে।

(৪) বেলা তো অনেক হল, কাজ সেরে না নিলে বেরোতে পারব না।

(৫) কি ব্যাপার অমন তাণ্ডব নাচ শুরু করে দিলে যে।

(৬) কি সুন্দর নীলাকাশ।

(৭) গ্রামের রাস্তার এই কাদাই সবচেয়ে বিরক্তিকর জিনিস।

'খ'

টকাটক, টপটপ, প্যাচ প্যাচ, আমতা-আমতা, ঝকঝক, ঝিকিমিকি, খিলখিল, কলকল, কিচ্‌কিচ, কুটুর মুটুর ধেইধেই, খলখল।

উত্তর—(১) অন্যায় করেছে তো, ওইজন্য বকুনি খেয়ে ওরকম আমতা-আমতা করছে।

(২) বাচ্চাটা কি সুন্দর দেখ, কেমন খিলখিল করে হাসছে।

(৩) সারারাত অন্ধকারে ইঁদুর গুলো কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ করে ঘুরে বেড়িয়েছে আর উৎপাত করেছে।

(৪) বেলা তো অনেক হল, টকাটক্ কাজ সেরে না নিলে বেরোতে পারব না।

(৫) কি ব্যাপার অমন ধেই ধেই তাণ্ডব নাচ শুরু করে দিলে যে।

(৬) কি সুন্দর ঝক্‌ঝকে নীলাকাশ।

(৭) গ্রামের রাস্তার এই প্যাচ প্যাচে কাদাই সবচেয়ে বিরক্তিকর জিনিস।

বরুণ মজুমদার

রাজকুমারের ভিক্ষা—

এখন রাজপুত্রদেরও ভিক্ষা করতে হয়। ডেনমার্কের রাজকুমার কনসর্টের অবশ্য আগামী কিছুদিনের জন্য তাঁর পত্নীর কাছে হাত খরচার জন্য ভিক্ষে করতে হবে না। ডেনমার্কের শিল্পপতি ও আগামী রাজকুমার কনসর্টের ব্যবসায়ীরা জন্মদিনে তাঁকে অন্ততঃ দুলক্ষ কোনার অর্থ উপহার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজকুমার সম্প্রতি একটা সংবাদপত্রের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নিজেই অভিযোগ করেছিলেন যে সামান্য এক কাপ কফি অথবা এক গ্লাস বিয়ারের জন্য রানীর কাছে টাকা চাইতে হয়। সরকার ব্যয় হ্রাসের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার জন্যই রাজকুমারের পকেটে টান ধরেছে। তাঁর জন্য আলাদা খরচের কোনো সংস্থান নেই। সুতরাং তাঁকে খুশী করার কোনো উপায় নেই।

সবচেয়ে লম্বা মহিলা—

আপনি লম্বা হোন বা বেঁটে হোন আপনি অসুখ বিসুখকে এড়াতে পারবেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মহিলা স্যাণ্ডি অ্যালেন লম্বায় ৭ ফুট ৭ ইঞ্চি। তাঁর মস্তিষ্কে একটা টিউমার অস্ত্রোপচার করে বাদ দেবার পর তিনি এখন ভাল আছেন। আঠাশ বছর বয়স্কা এই মহিলার পিটুইটারী গ্রাণ্ডে টিউমার হয়েছিল। আর এর জন্য তিনি দিন দিন লম্বা হয়ে যাচ্ছিলেন। টরান্টোর ওয়েলেসলি হাসপাতালে গত শুক্রবার অস্ত্রোপচার করে তাঁর টিউমার অপসারণ করা হয়। টরান্টোর নায়গ্রা জলপ্রপাতের কাছে গিনিস বিশ্বরেকর্ড মিউজিয়ামে তিনি কাজ করেন। এর আগে ১৯৭৮ সালে মিস অ্যালেনের দেহে একই ধরনের একটা অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল।

পিরামিডের বিপত্তি—

মিশরের মমির কথা শোনেননি এমন লোকের সংখ্যা খুব কমই আছে। এই মমি দেখতে ওখানে রীতিমত দর্শকের ভীড় হয়। কিন্তু মমি এখন দর্শকদের রীতিমত বিরূপ করে তুলেছে। গিজাতে দ্বিতীয় বৃহত্তম কারাওনি পিরামিড দেখতে গিয়ে দর্শকরা রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সেই পিরামিডের ফাটল দিয়ে একরকম রহস্যজনক গ্যাস বের হচ্ছে। পর্যটকরা সেই গ্যাস নাকে যেতেই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। তাঁদের শ্বাস কষ্ট হচ্ছিলো এবং চোখ ফুলে যাচ্ছিলো। তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগও করেন। কিন্তু ঐ গ্যাস কোথা থেকে আসছে তা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও জানা যায়নি। কর্তৃপক্ষ তাই ঐ পিরামিড দেখা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কায়রোর দক্ষিণে

চেকয়েন হল গিজার তিনটি বিখ্যাত পিরামিডের মধ্যে একটি। অসামরিক প্রতিরক্ষা ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা কমিটিও গঠন করা হয়েছে। তাঁরা ঐ পিরামিডের গিরিপথ ও চেম্বার গুলোতে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে দর্শকদের অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ পেয়েছেন। কিন্তু ঐ গ্যাসের উৎস বা তার রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে পারেননি।

বন দেবতার জন্য

আদিবাসীদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার উত্তরপূর্বাঞ্চলের মেঘালয়ে খাসি ও জয়ন্তিয়া বনাঞ্চল সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, বনাঞ্চলের ক্ষতি করলে তাঁদের দেবতা রুষ্ট হবেন।

উত্তরপ্রদেশের প্রাকৃতিক ও আবহাওয়া ভারসাম্য দপ্তরের এক সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গেছে। সমীক্ষায় আরো জানা গেছে যে, শুকনো পাতা, ফল প্রভৃতি সরানোতে তাঁদের আপত্তি আছে। স্থানীয় আদিবাসীরা বিশ্বাস করেন যে, জঙ্গলের যিনি ক্ষতি করবেন বা সেখানকার জন্তু জানোয়ার যিনি হত্যা করবেন তাঁর শাস্তি মৃত্যু। এমনকি সাপকে তাঁরা মারেন না। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন এই বিশ্বাসে যে একটি সাপকে মারলে অনেকগুলি সাপ তার বদলে জন্মাবে এবং দোষী ব্যক্তিকে তারা শেষ করবেই। আর এঁদের এই বিশ্বাস ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিরাট বনভূমি সৃজনে ও সংরক্ষণে সাহায্য করছে।

সাঁতারে প্রতিবন্ধীর রেকর্ড

তারানাথ শেনয় নামে একজন প্রতিবন্ধী গত ১৫ই মার্চ Gateway of India থেকে Dharamtar পর্যন্ত সাঁতার কেটে এক অভিনব রেকর্ড করেছেন। যাতায়াতে এই পথের দূরত্ব ৪২ নৌ মাইল।

৪২ বছর বয়স্ক তারানাথ একজন মূক ও বধির এবং চোখেও ভাল দেখতে পান না। তিনি এর আগে গতবছর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে বিশ্বরেকর্ডের গৌরব অর্জন করে।

এবারের এই সাঁতারের আয়োজন করেছিল মহারাষ্ট্রের State Amatuer Aquatic Association। তারানাথ এবছর ইংলিশ চ্যানেল উভয় পথে অতিক্রম করবার কথাও ঘোষণা করেছেন।

খর্বাকৃতিদের গ্রাম

আমরা ইংরেজি গল্পে লিলিপুটদের দেশের কথা পড়েছি। অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং জেলার দুটি গ্রামের আদিবাসী বাসিন্দাদের সকলেই খর্বাকৃতি। সম্প্রতি কলকাতার অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্থ পরিচালিত এক সমীক্ষার প্রাথমিক প্রতিবেদনে একথা জানা যায়। সমীক্ষক দলের নেতা ডাঃ এ, কে, ভট্টাচার্য বলেন যে ওই গ্রাম দুটির আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে কারোরই উচ্চতা ৫ ফুটের ওপর নয়। সেই সঙ্গে তাদের সকলেরই কোন না কোন একটি দৈহিক অক্ষমতা রয়েছে। কেউ কেউ মূক ও বধির, কারো বা গলগণ্ড রয়েছে। ডাঃ ভট্টাচার্য জানান যে এই বিচিত্র অবস্থার পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চকে অনুরোধ করেছেন।

বাঘ শিকারের জন্য পুরস্কার

ওড়িশা সরকার কোরাপুট জেলার একটি মানুষ খেকো বাঘ শিকারের জন্য পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। গত বছর থেকে এ বছর ফেব্রুআরি ২২ তারিখ পর্যন্ত বাঘটি মোট ২৯ জন মানুষের প্রাণ নিয়েছে। এছাড়া বাঘটি আরও ৪৩ ব্যক্তিকে ঘায়েল করেছে। ওড়িশা সরকার জানিয়েছেন যে বাঘটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার জাতের।

শব্দমালা

প্রদীপ কুমার দত্ত

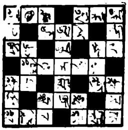

সূত্র :—

উপরনীচঃ—১ নিদ্রার ভান।

২ পরের অধীনে যে কাজ করে।

৩, শেষে একটা 'রে' থাকলেই খুব কথা বলতে পারে এমন বোঝাত।

৪, শিমুল গাছ।

৬ শ্রীকৃষ্ণ, শেষে যদি রাজা না থাকত তবে গরু চরিয়েই মরত।

৮ জীবন-বৃত্তান্ত।

৯ থানার দ্বাররক্ষী।

১১ রাজসভার ঘোষক।

১৩ প্রধানতঃ পশুপক্ষীর তীক্ষ্ণধার।

১৪ পত্রাদির আবরণ।

১৫ উলঙ্গ সন্ন্যাসী—সম্প্রদায় বিশেষ।

পাশাপাশি—১ ২৪-পরগনা জেলার ২৪টি-পরগনার একটি।

৩ ইসলাম ধর্মের মূল।

৫ পান্থশালা।

৭ বালি ও একপ্রকার ক্ষার হইতে প্রস্তুত স্বচ্ছ বস্তু।

৯ গহ্বর।

১০ ছোট বন্দুক।

১১ ভূতলের দিকে নিবদ্ধ।

১২ সঙ্গীতে রাগরাগিনীর প্রধান সুর।

১৪ জমিদারের প্রাপ্য কর।

১৬ সামান্য বাঁকা।

১৭ কান্দাহারের প্রাচীন নাম।

(উত্তর ৬৬ পৃষ্ঠায়)

কথামালায় শব্দ

নীচের ছকগুলির ফলাফল কি?

(ক)

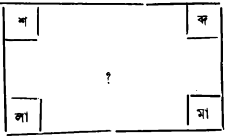

(খ)

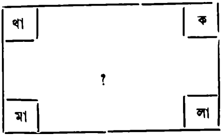

(গ)

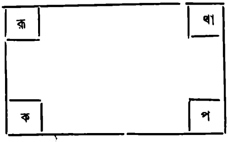

* উপরের ছকের মধ্যে একটি করে শব্দ আছে। সঠিক যে লিখে পাঠাবে তার নাম আগামী সংখ্যায় পাবে।

বুদ্ধির খেলা

পিকচার ওয়ার্ড

বিধু দত্ত

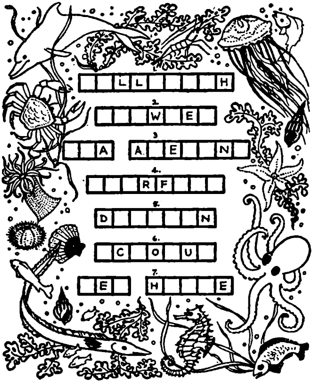

ছবিটি দেখে সমুদ্রের কি কি জিনিস আছে বল। ওয়ার্ডগুলো ইংরেজিতে পূর্ণ করতে হবে। তা হলেই তোমার ঐগুলোর ইংরেজি নামা জানা হয়ে যাবে।

ফাঁকা ঘরের মধ্যে, সামনে, পিছনে, অক্ষর দেওয়া আছে সেগুলির ছবি দেখে কোনটি কোনটি কোন ঘরের উপযুক্ত ঠিক ইংরেজি শব্দে শব্দে ভর্তি কর।

উত্তর :

1. Jelly fish. 2. Seaweed. 3. Sea Anemone. 4. Star Fish. 5. Dolphin. 6. Octopus. 7. Sea Horse.

শব্দ সন্ধানের সমাধান:—

উপরনিচ : ১ মটকা, ২ দাস, ৩ কই, ৪ মান্দার, ৬ রাখাল রাজা, ৮ চরিত, ৯ দরজা, ১১ নকিব, ১৩ নথর, ১৪ ঘাম, ১৫ নাগা।

পাশাপাশি : ১ ময়দা, ৩ কলমা, ৫ সরাই, ৭ কাচ, ৯ দর, ১০ রিভলবার, ১১ নভ, ১২ জান, ১৪ খাজানা, ১৬ বঙ্কিম, ১৭ গান্ধার।

- ★ WI[illegible]D RESISTOR upto 1000 watts
- ★ INDUSTRIAL RESISTOR upto 3000 watts
- ★ POTENTIOMETER 1 watts upto 5 K.
- ★ POTENTIOMETER 3 watts upto 33 K.
- ★ TORODIAL POWER RHEOSTATS upto 1000 watts
- ★ SLIDING RHEOSTATS upto 50 Amps
- ★ NON-INDUCTIVE RESISTORS upto 1000 watts
- ★ FERRULE TYPE RESISTORS upto 300 watts
- ★ A[illegible]IAL LEAD RESISTORS upto 12 watts

TYPE TRC

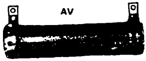

AV

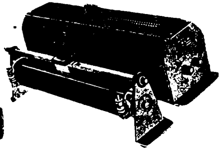

AVA

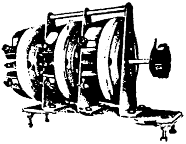

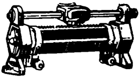

C R C

CALCUTTA RESISTANCE COMPANY

27, BIPIN BEHARI GANGULY STREET,
POST BOX NO. 7803
CALCUTTA-700012

Gram : WIREWINDER

Phone : 26-7970

* শুকতারা * সংখ্যা * ১৯৯১ * ১.৫০ টা
Rs. 2·50 * [redacted]/SE 34 * Regd. W.B.CC 4(

এবারের শারদ সংখ্যা

শুকতারা

অজস্র রঙীন ছবি নিয়ে

বেরুচ্ছে সেপ্টেম্বরের গোড়ায়

৬টি উপন্যাস লিখছেন ৬টি বড় গল্প লিখছেন

বিশেষ রচনা লিখছেন :—

সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অদ্রীশ বর্ধন, তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী, সমরেশ মজুমদার, শক্তিপদ রাজগুরু, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধর সেনাপতি, শিশির কুমার মজুমদার, বরুণ মজুমদার, ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দত্ত, অর্ঘ্য দাশ, ধূর্জটি চন্দ, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলী বসু, অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়, সর্বাণী সাধুখাঁ, সমীরণ মুখোপাধ্যায়, অনিল কুমার দলুই, রাধারমণ রায়, গৌতম ঘোষ, প্রদীপ কুমার দত্ত, অমিতাভ বসু, পুলক দেবনাথ, অনীশ দেব, শ্রীপার্থ ও অনেকে

সঙ্গে বিশেষ আকর্ষণ ৬টি চিত্র কাহিনী

ছড়ায় থাকছেন

অন্নদাশঙ্কর রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রঞ্জন ভাদুড়ী, হান্নান আহসান, সাধনা মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, শ্যামলকান্তি দাশ, সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার মিত্র, অমল ত্রিবেদী, ঈশ্বর দত্ত, কার্তিক ঘোষ, দাউদ হায়দার, মৃণালকান্তি দাশ, পঞ্চানন মালাকার, গৌরীশঙ্কর রায়, রবীন সুর, মুস্তাফা নাশাদ অভিজিৎ সেনগুপ্ত ও অনেকে।

ধাঁধা, শব্দ সন্ধান, মজার খেলা, বুদ্ধির খেলা, ছবি আঁকা, হাস্যকৌতুক নিয়ে ৩০০ পৃষ্ঠায় রঙিন প্রচ্ছদ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হবে।